মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী
দিনাজপুর সদর উপজেলা

মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী
দিনাজপুর সদর উপজেলা

ড. মাসুদুল হক
ইয়াসমিন সুলতানা
মোয়াজ্জেম হোসেন
লাকী মারান্ডী

গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র
দিনাজপুর, বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২৩

ISBN : 978-984-35-4250-2

প্রকাশক

গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র

দিনাজপুর, বাংলাদেশ

প্রকাশনা সহযোগিতায়

শাপলা নীড়, ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ

আলোকচিত্রী মোহাম্মদ আলমের তোলা ছবি অবলম্বনে   রাশেদ রানা

মুদ্রণ

নৈঋতা ক্যাফে

ফ্ল্যাট : ৮/১, বাসা : ৩/৩, ব্লক : ই, লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

অফিস : +88-01977-731146 ॥ +88-01951-353141

noihrita.cafe@gmail.com ॥ www. noihritacafe.com

Muktijuddhe Adibasi : Dinajpur Sadar Upazila [The Role of Adibasi in Liberation War : Dinajpur Sadar Upazila] by Masudul Hoq,Yesmin Sultana, Moazzem Hossain& Lucky Marandy. Gram Bikash Kendra, Dinajpur. **1st Edition:** March 2023.

উৎসর্গ

শহিদ শিবরাম মাঝি (?-১৯৪৭)

তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম আদিবাসী সাঁওতাল যোদ্ধা। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারির ৪ তারিখ তেভাগার দাবি আদায়ে দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দরের ভিয়াইল(চিন্ততলা) গ্রামে প্রতিবাদরত অবস্থায় ক্ষেতমজুর সমিরুদ্দিন পুলিশের গুলিতে নিহত হলে, এর প্রতিবাদে সাঁওতাল যুবক শিবরাম মাঝি তীর-ধনুকের সাহায্যে পুলিশকে হত্যা করলে তৎকালীন বৃটিশ পুলিশের গুলিতে নির্মমভাবে নিহত হন।

শহিদ কম্পরাম শিং (১৮৮৭-১৯৫০)

তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেতা। রাজবন্দি অবস্থায় ১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে তৎকালীন পাকিস্তানি সরকারের ষড়যন্ত্রে খাপড়া ওয়ার্ডে বন্দি অবস্থায় জেল কতৃপক্ষের গুলিতে শহিদ হন।

কমরেড রূপ নারায়ণ রায় (?-১৯৭৪)

তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেতা। ১৯৪৬ সালের অবিভক্ত ভারতের নির্বাচনে তিনি কমিউনিস্ট পার্টি থেকে এমএলএ নির্বাচিত হন। মহান মুক্তিযুদ্ধে গেরিলা বাহিনীর অন্যতম সংগঠক ছিলেন। ১৯৭৪ সালের ২৪ মার্চ দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি থানার খয়েরবাড়ি এলাকার লালপুর গ্রামে নিজ বাড়িতে আততায়ীদের হাতে শহিদ হন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ কর্নেল মার্ডি (১৯৫৬-১৯৭২)

দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার আদিবাসী শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম সাঁওতাল মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭২ সালের ৬ জানুয়ারি দিনাজপুর সদর উপজেলার মহরাজা গিরিজানাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রানজিট ক্যাম্পে মাইন বিস্ফোরণে শহিদ হন।

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯

পটভূমি ১৩

ক. জেলার ভৌগোলিক বিবরণ

খ. জেলার ইতিহাস

গ. ১৯৪৭ পূর্ব প্রতিরোধের ঐতিহ্য

ঘ. জেলার সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ইতিহাস: ১৯৪৭-১৯৭০

ঙ. ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও তার প্রতিক্রিয়া

চ. অসহযোগ আন্দোলন ১৯৭১

ছ. জেলার মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ছাত্র ও পেশাজীবী সংগঠন

সদর উপজেলার পরিচিতি ৬৩

সদর উপজেলার আদিবাসী সমাজ ৬৬

সদর উপজেলার আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা: পরিচয় ও ভূমিকা ৭৯

উপসংহার ৯৯

পরিশিষ্ট-১: মাঠ পর্যায়ে তথ্য নথিভুক্তকরণ দল ১০১

পরিশিষ্ট-২: সারণি ১০২

পরিশিষ্ট-৩: গ্রন্থপঞ্জি ১০৪

পরিশিষ্ট-৪: এ্যালবাম ১০৬

ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধ বাংলা ভূখণ্ডে বসবাসরত বৈচিত্রপূর্ণ আদিবাসী জাতিসত্তা ও বাঙালিদের হাজার বছরের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি সংঘবদ্ধ ও পরিণত রূপ। তেইশ বছরের পাকিস্তানি অভ্যন্তরীণ-উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার স্বরূপ। সেই অর্থে বাঙালির ইতিহাসের এই গৌরবময় ঘটনায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেকটি নগর, বন্দর ও জনপদ অভূত সামষ্টিক চেতনায় জেগে ওঠে। বাংলাদেশের সীমান্ত জেলা দিনাজপুরে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। এই সংগ্রামে দিনাজপুর জেলার ঐতিহ্য ছিল গৌরবময়। সীমান্ত জেলা হিসেবে একদিকে যেমন এই জেলায় পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্র ছিল তুলনামূলকভাবে অধিক; তেমনি তার সহায়ক শক্তি হিসেবে অবাঙালি বিহারি ও দেশীয় রাজাকার-আলবদর জেলার সংগ্রামকে করে তুলেছিল কঠিনতর ও দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যান্য জেলার মতোই সংগ্রামী জনগণ গড়ে তুলেছিল এক শক্তিশালী প্রতিরোধ বাহিনী। সীমান্ত জেলা হিসেবে দিনাজপুর ইপিআর-বাহিনীর প্রায় পাঁচশত বাঙালি-সদস্য ২৫ মার্চ দিনাজপুরে অবস্থান করছিল। ফলে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা অনেকটা সহজতর হয়।

মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুরের প্রতিরোধ সংগ্রামের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। ২৮ মার্চ ১৯৭১, সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত প্রায় একশত সদস্যের পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ছাত্র-জনতা, ইপিআর ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের সম্মিলিত প্রতিরোধ বাহিনী এক গৌরবময় সংগ্রাম পরিচালনা করে। তারা কুঠিবাড়িতে অবস্থিত ইপিআর-বাহিনীর উইং এবং সেক্টর হেডকোয়ার্টার দখল করে নেয়। সেদিন কুঠিবাড়ি দখলের ফলে পাকিস্তানি সেনাদের অনেক অস্ত্রশস্ত্র বাঙালিদের দখলে চলে আসে। বাঙালিদের বিরুদ্ধে একই দিনে পাকিস্তানি বাহিনীর সৈন্যরা পুনরায় আক্রমণ চালাবার ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। ৩-৪ দিন যাবৎ খণ্ড যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার পর বাঙালিদের প্রতিরোধ বাহিনীর আক্রমণে টিকতে না পেরে ৩১ মার্চ পাকিস্তানি সেনারা রাতের অন্ধকারে দিনাজপুর থেকে পালিয়ে যায়। পরে এদের অনেকেই জনতার হাতে নিহত হয়। কিন্তু ১৩ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী ট্যাংক ও আর্টিলারি-বাহিনীর সাহায্যে ব্যাপক আক্রমণ চালালে বাঙালি প্রতিরোধ বাহিনী পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। সেদিন সন্ধ্যার পূর্বেই পাকিস্তানি বাহিনী পুনরায় দিনাজপুর দখল করে নেয়। প্রতিরোধ বাহিনী দিনাজপুর সদর থেকে সরে গিয়ে ভারতে ট্রেনিং নিয়ে অন্যান্য জেলার মতোই মুক্তিবাহিনী রূপে দেশে ফিরে আসে এবং চালাতে থাকে গেরিলা যুদ্ধ। একে একে মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন অবস্থানের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তানি বাহিনী

আক্রমণ করতে শুরু করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাকিস্তানি বাহিনী বিমান আক্রমণের সাহায্য নেয়। এতদসত্ত্বেও মুক্তিবাহিনীর অভিযান অব্যাহত থাকে। পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে তাদের যে-সকল সংঘর্ষ হয়েছিল তার মধ্যে ফুলবাড়ি, বিরামপুর, খানসামা, দশমাইল, ভাতগাঁও, ভুষিরবন্দর, চম্পাতলী, কিশোরীগঞ্জ, হিলি প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জেলার বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি বাহিনী ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল। তা সত্ত্বেও এই জেলার মুক্তিপাগল জনতা, ইপিআর-বাহিনী এবং পাকিস্তানি বাহিনীর বাঙালি সদস্যগণ দীর্ঘ নয় মাস যাবৎ যে প্রচন্ড প্রতিরোধ ও মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনা করেছিল তা চিরস্মরণীয়। এছাড়া ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত দিনাজপুর জেলার আপামর জনতা যে অমিত বিক্রমে হানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লড়াই করেছেন, তাও ইতিহাসে বিরল।

জেলার তেরো উপজেলাতেই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে। বিভিন্ন উপজেলায় আবিষ্কৃত হচ্ছে গণহত্যা-গণকবর ও বধ্যভূমি। অনেক মুক্তিযোদ্ধা ইতোমধ্যে প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু তাদের ভূমিকা রয়ে গেছে জেলার আঞ্চলিক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর অতিক্রম হয়েছে অথচ ব্যক্তি পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্যায়ন ও ভূমিকা আমাদের উত্তর-প্রজন্মের কাছে বিস্মৃত প্রায়। দিনাজপুর বাঙালি ও আদিবাসী জনমণ্ডলের অধিবাসস্থল। এখানে বাঙালিদের পাশাপাশি আদিবাসী বিভিন্ন জাতিসত্তার লোকজীবন ও সংস্কৃতি বৈচিত্র্যের সম্ভারে পরিপুষ্ট হয়েছে। এদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় দিনাজপুর অঞ্চলের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডল একটি নিজস্ব ধরন তৈরি করে নিয়েছে। যে কারণে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা থেকে দিনাজপুর স্বতন্ত্র; এর কৃষি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক চারিত্রে। বাঙালিদের পাশাপাশি আদিবাসী ব্যক্তির ভূমিকাও নানা ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। দিনাজপুরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবলোকন করলে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে উঠে আসে আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক শ্রুত-বিশ্রুত মুখ। এই মানুষগুলোকে বাংলাদেশের আঞ্চলিক মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ণের জন্য তুলে আনা প্রয়োজন। দিনাজপুর তেরো উপজেলায় বিভক্ত। প্রত্যেক উপজেলাতেই আদিবাসী জাতিসত্তার বসবাস রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে তাদের ভূমিকা সামগ্রিকভাবে তুলে আনতে হলে- আমরা মনে করি তেরো উপজেলার আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করা প্রয়োজন। গবেষণার সুবিধার্থে আমরা দিনাজপুর সদর উপজেলাকে বেছে নিয়েছি। প্রাথমিক এই কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা ও মূল্যায়নের একটি গতিপথ তৈরি হবে। ভবিষ্যতে আগ্রহী প্রতিষ্ঠান বা গবেষকগণ জেলার মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসীদের ভূমিকা পর্যালোচনায় এই গ্রন্থটিকে পাথেয় হিসেবে নির্ধারণ করতে পারবে।

সেইসঙ্গে অন্যান্য উপজেলার আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান নিয়ে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হবেন।

দিনাজপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসীদের ভূমিকা বিষয়ক সামগ্রিক ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা আমাদের এ গ্রন্থে সীমাবদ্ধ নয়। পাভেল পার্থ ও মোয়াজ্জেম হোসেন *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা (প্রথম খণ্ড)* শীর্ষক একটি গ্রন্থ দিনাজপুরের আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সম্পাদনা করেছেন। এছাড়া ব্যক্তি পর্যায়ে কেউ কেউ দিনাজপুরের আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কাজ করছেন। আমরা ভালো করেই জানি ব্যক্তি পর্যায়ে এমন উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা কতখানি। বৃহত্তর জনমণ্ডলের পাশাপাশি আদিবাসীদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য রচনার প্রচেষ্টা অনেকক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুরের আদিবাসীদের ভূমিকা পর্যালোচনার বিষয়টিও সে-পর্যায়ভুক্ত। এক্ষেত্রে গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র ও শাপলা নীড় এগিয়ে এসেছে। বিশেষ করে শাপলা নীড়-এর কান্ট্রি ডাইরেক্টর তোমাকো উচিয়ামা-কে আমরা অভিবাদন জানাই। তাদের উদ্যোগের কারণে আমাদের এ প্রয়াসটি সম্ভব হয়েছে। বেশ কয়েকবার জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন এবং শাপলা নীড়-এর জনাব আনিসুজ্জামানের সঙ্গে মিটিং ও আলোচনার মাধ্যমে এ গ্রন্থের দিক্‌স্থিতি নির্মিত হয়। তাদের পরামর্শ অভিজ্ঞতার পাশাপাশি দিনাজপুরের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থগুলোর পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা মাঠ পর্যায়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা শুরু করি। এ কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম রেখা হাঁসদা, তুষার শুভ্র বসাক, এলিয়নোরা বারলা, বীরজিনিয়া হাঁসদা, মানিক সরেন, অর্চনা দেবী সরেন প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন শাপলা নীড়-এর সহযোগিতায় অধিকার প্রকল্পের একদল স্বেচ্ছাসেবক তরুণ ক্ষেত্র সমীক্ষক। যারা দিনাজপুর সদর উপজেলার আদিবাসী গ্রামগুলোতে ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজ করেছে। এ ক্ষেত্র সমীক্ষা মূলত সাক্ষাৎকার ও এফজিডি পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। এরপর তথ্য বিশ্লেষণ, মূল্যায়নকে গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসেবে ধরে সন্দর্ভটি প্রণয়ন করা হলো। এতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ও আদিবাসী বিষয়ক নানা গ্রন্থ দ্বিতীয় উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী: দিনাজপুর সদর উপজেলা শীর্ষক গ্রন্থটি প্রণয়নের মাধ্যমে আমরা লক্ষ্য করেছি মূলধারার মুক্তিযোদ্ধাগণের সুযোগ সুবিধা ও সম্মানের বিষয়টি বিবেচনায় নিলে দিনাজপুর সদর উপজেলার আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধারা অনেক ক্ষেত্রেই অবহেলিত। রাষ্ট্রীয় সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে মুক্তিযোদ্ধাদের যেভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্যায়নের বিষয়টি প্রায় উপেক্ষিত। আদিবাসীরা প্রকৃতিলগ্ন জীবনযাপন ও তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যকেন্দ্রিক মূল্যবোধ দিয়ে জীবনকে পরিচালিত করতে অভ্যস্ত। তাদের মধ্য থেকে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন; সেই আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই পাননি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, ভাতা

ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করে গেলেও এখনো আমরা পাইনি কোন সমতাভিত্তিক সমাজ কাঠামো। যা সত্যিই পরিতাপের বিষয়। এ গবেষণা এবং গ্রন্থ প্রণয়নে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার প্রতি আমাদের শুভকামনা। বিশেষ করে সদর উপজেলার আদিবাসী গ্রামগুলোতে ক্ষেত্র সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা কালে সাক্ষাৎকার, এফজিডিতে তথ্য প্রদানে অকৃপণভাবে সহযোগিতা করেছেন আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবার; গ্রামগুলোর জনগোষ্ঠী ও তাদের মানঝিহাড়াম, জগমাঝি, পারাণিক, গডিত, দিঘরী পরিষদ, মণ্ডলগণ। এ গ্রন্থটি প্রণয়নে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি রয়ে গেছে; সদর উপজেলার আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের সামগ্রিক চাওয়া-পাওয়া ও দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণতর অভিজ্ঞান হয়তো উঠে আসেনি; রয়ে গেছে অনেক সীমাবদ্ধতা। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে আদিবাসী লেখক, সংগঠক ও গবেষক আমাদের অপূর্ণতা দূর করবে।

বইটি সংশ্লিষ্ট সকলের কল্যাণ হোক।

পটভূমি

জেলার ভৌগোলিক বিবরণ

বাংলাদেশের প্রাচীনতম জনপদ দিনাজপুর। অতি প্রাচীনকালেই দিনাজপুরে মানব-বসতি গড়ে ওঠে। সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক বিকাশের ক্রমবিবর্তনের ধারায় এই জনপদে ইতিহাস ও ঐতিহ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির আবিভার্ব ঘটে। সর্বভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এই জেলা মৌর্য ও গুপ্ত রাজ্যের তাম্রশাসন পদ্ধতি, যাতায়াত ব্যবস্থা, নগরায়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিসহ সর্বস্তরের বিকাশ, উন্নয়ন ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিস্তার লাভ করে। এই জনপদে বসবাসরত হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও প্রকৃতিবাদী ধর্মের মানুষদের অবস্থান বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের আগমনে মিশ্রিত লোকাচারে সামাজিক গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে জন্ম দেয় নতুন দর্শন, নতুন চিন্তা-চেতনায় সমন্বিত এক সংস্কৃতি। তাই কালের ক্রমবিবর্তনে দিনাজপুর সর্বভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শনে পরিচিতি লাভ করে। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে তেরো শতকের প্রথম ভাগে মুসলিম অভিযাত্রীদের আগমনে কালক্রমে দিনাজপুর হয়ে ওঠে হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম- এই ত্রিধারার মিলনভূমি। ফ্রান্সিস বুকানন-হেমিলটন সাহেবের বর্ণনা মতে ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ঐতিহ্যমণ্ডিত এই দিনাজপুর জেলা গঠিত হয়। ত্রিভূজের মতো এই জেলা দিনাজপুর ২৪°১৮' থেকে ২৬°১৮' উত্তর অক্ষরেখার ভেতরে ৫,৩৭৪ বর্গমাইল নিয়ে স্থিত ছিল। সেই সময় পশ্চিমে- নাগর ও মহানন্দা নদী, দক্ষিণে- পুনর্ভবা নদী, পূর্বে- করতোয়া ও উত্তরে- সুনির্দিষ্ট কোনো জেলা সীমারেখা ছিল না। দিনাজপুর জেলা তখন বাইশটি থানা নিয়ে গঠিত ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি পৃথক কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিচালিত হতো। উল্লেখ্য যে, '৪৭ এর বিভাজনের সময় দিনাজপুর জেলার কয়েকটি থানা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার বোদা, তেঁতুলিয়া, দেবীগঞ্জ ও পঞ্চগড়, এই চারটি থানা দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যদিকে উক্ত দিনাজপুর জেলার ধামইরহাট, পত্নীতলা ও পোর্শা থানা তিনটি তৎকালীন রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। অবিভক্ত ভারতের সাবেক দিনাজপুর জেলাটি দুটি ভূখণ্ডে পৃথক হয়। জেলার পূর্ব অংশটি পূর্ব-পাকিস্তানের দিনাজপুর জেলা এবং পশ্চিম অংশটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর জেলা নামে পৃথক হয়। দিনাজপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল- বর্তমানে তিনটি জেলায় বিভক্ত দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় এলাকায়। আলোচ্য গ্রন্থটি যেহেতু শুধুমাত্র বর্তমান দিনাজপুরের মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করবে সেহেতু আমরা ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়ের বিস্তৃত বর্ণনা থেকে বিরত থাকবো। তাই বর্তমান আলোচ্য দিনাজপুরের সীমারেখা হচ্ছে- উত্তরে ঠাকুরগাঁও জেলা,

দক্ষিণে জয়পুরহাট ও গাইবান্ধা জেলা, পূর্বে নীলফামারী ও রংপুর জেলা, পশ্চিমে ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা। বর্তমানে দিনাজপুর জেলার আয়তন ১৪৭৫.৭০ বর্গ কিলোমিটার । যার ইউনিয়নের সংখ্যা ৪৪০৫ টি, ওয়ার্ড সংখ্যা ৫৪৩টি। **১৯৯১** সালের আদমশুমারী অনুযায়ী দিনাজপুরের জনসংখ্যা **১০৬৩১৪৯৯২** এবং শিক্ষিতের হার ৩২.৪ । বর্তমানে তেরোটি থানা নিয়ে দিনাজপুর জেলার অবস্থান। থানাগুলো হচ্ছে: দিনাজপুর সদর, বিরল, কাহারোল, বীরগঞ্জ, বোচাগঞ্জ, খানসামা, চিরিরবন্দর, ফুলবাড়ি, পার্বতীপুর, বিরামপুর, নবাবগঞ্জ, হাকিমপুর ও ঘোড়াঘাট।

উক্ত তেরোটি থানার সর্বত্রই মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি। তেরোটি থানা জুড়ে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গন। এর প্রতিটি পথ-ঘাট, ঘরবাড়ি, নদী-নালা, খাল-বিল, বন-বনানী, আকাশ-বাতাস সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যা, নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা এবং রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যদের মানবতা বিরোধী পৈশাচিক ভূমিকা। আবার অপরদিকে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধে হাজার হাজার মানুষের সংগ্রামী অংশগ্রহণ; রয়েছে তাদের আত্মত্যাগ, মাহাত্ম্য ও বীরগাথা।

প্রায় সমতল ভূমিতে অবস্থিত কৃষি-নির্ভর দিনাজপুর জেলা উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ঢালু ও জঙ্গলময়। ফলে সুপ্রাচীনকাল থেকে হিমালয় আগত নদীগুলির প্রবাহ ছিল সাবলীল। কালের আবর্তে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম কারণে নদীগুলোর নাব্যতা ক্রমেই ক্ষীণ হচ্ছে। বর্তমানে দিনাজপুর জেলার মূল নদী আত্রাই। এর শাখা-নদী ঢেপা ও কাঁকড়া। এছাড়াও পুনর্ভবা, গর্ভেশ্বরী, ইছামতি, ছোট যমুনা নদী-সহ ছোট-বড় অনেক নদী-নালা, খাল-বিল রয়েছে। দিনাজপুরের পূর্ব-সীমানা বরাবর বয়ে চলেছে করতোয়া নদী।

এই জেলার মুখ্য যাতায়াত– স্থলপথ ও রেলপথ। স্থলপথের মধ্যে কাঁচা রাস্তা ও পাকা রাস্তা উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধকালীন অবস্থায় যে-সকল স্থলপথগুলো ব্যবহার করা হতো সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাঁচা-পাকা রাস্তাগুলো হচ্ছে:

ক. দিনাজপুর শহর থেকে সোজা দক্ষিণ দিকে পুলহাট-শিকদারহাট হয়ে রামসাগরের পাশ দিয়ে খানপুর হয়ে যে রাস্তাটি ভারতে ঢুকেছে, সেটি দিনাজপুর শহর থেকে ভারতীয় সীমান্তে পৌঁছানোর সবচেয়ে নিকটতম দূরত্বের রাস্তা। শহরের জিরো পয়েন্ট থেকে যার দূরত্ব মাত্র ১২ কিলোমিটার। এই রাস্তাটি দার্জিলিং-মুর্শিদাবাদ রোড নামে খ্যাত। অপর একটি রাস্তা দিনাজপুর শহরের পুলহাট থেকে মিশন স্কুলের পাশ দিয়ে কসবা হয়ে- পুনর্ভবা নদীর কোলঘেঁষে ঘুঘুডাঙ্গা হয়ে ভারতের হামজাপুর সীমান্তে পৌঁছেছে। এই রাস্তারই

একটি শাখা পুলহাট থেকে বেরিয়ে গোদাগাড়ি হয়ে মুরাদপুরের পাশ দিয়ে কমলপুরে পৌঁছেছে।

খ. দিনাজপুর শহরের পূর্ব দিকের সড়কটি শহরের বটতলী-মহারাজা মোড় থেকে শেখপুরা-আউলিয়াপুর-চিরিরবন্দর-পার্বতীপুর হয়ে উত্তর দিক দিয়ে সৈয়দপুরে প্রবেশ করেছে। এই সড়কটি দিনাজপুর-পার্বতীপুর সড়ক নামে খ্যাত।

গ. দিনাজপুর শহর হতে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে ফুলবাড়ি বাসষ্ট্যান্ড হয়ে মোহনপুর ব্রিজ-আমবাড়ি-ফুলবাড়ি-বিরামপুর-ঘোড়াঘাট হয়ে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জে বিশ্বরোডে মিলেছে। রাস্তাটি দিনাজপুর-ঘোড়াঘাট সড়ক নামে খ্যাত। এই রাস্তার আর একটি শাখা বিরামপুর থেকে হাকিমপুর থানার বাংলাহিলি হয়ে জয়পুরহাট জেলায় প্রবেশ করেছে। এই রাস্তাটি দিনাজপুর-হিলি সড়ক নামে খ্যাত। এই রাস্তার অপর একটি শাখা বিরামপুর হয়ে নবাবগঞ্জ থানায় পৌঁছেছে। রাস্তাটি দিনাজপুর-নবাবগঞ্জ সড়ক নামে পরিচিত।

ঘ. দিনাজপুর শহর থেকে পশ্চিম দিকে পুনর্ভবা নদী পার হয়ে বিরল সড়কটি পাকুড়া-ঠনঠনিয়া হয়ে ভারতের রাধিকাপুরে প্রবেশ করেছে। তাই এই রাস্তাটি দিনাজপুর-রাধিকাপুর সড়ক নামে পরিচিত। এই সড়কের অপর একটি শাখা পুনর্ভবা নদীর পশ্চিমপাড় থেকে পশ্চিম-উত্তর কোণ দিয়ে ফরাক্কাবাদ-মঙ্গলপুর-আটগাঁও-বোচাগঞ্জ থানা পেরিয়ে নাফনগর হয়ে ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ থানায় চলে গেছে। এই সড়কটি দিনাজপুর হরিপুর সড়ক নামে পরিচিতি। রাস্তাটির আরেকটি শাখা ধুকুরঝাড়ীহাটের পশ্চিমে ঢেরাপাটিয়া-ফুলবাড়িহাট হয়ে মাহেরপুরহাট দিয়ে টাঙ্গন নদী পার হয়ে ভারতের ডালিমগাঁয়ে গিয়ে মিশেছে।

ঙ. দার্জিলিং-মুর্শিদাবাদ সড়কটি দিনাজপুর শহরের জিরো পয়েন্ট থেকে উত্তরদিকে চেহেলগাজী-দশমাইল ও সুন্দরপুর ইউনিয়নের ভেতর দিয়ে কান্তজিউ মন্দিরের পূর্বদিক দিয়ে ঢেপা নদীর তীর ঘেঁষে ভাতগাঁও ব্রিজ অতিক্রম করে বীরগঞ্জ-কবিরাজহাট-দলুয়া হয়ে ঠাকুরগাঁওতে প্রবেশ করেছে। এই রাস্তার অপর একটি শাখা-রাস্তা বীরগঞ্জের সুজালপুর হয়ে বালিয়ার উপর দিয়ে সোজা বকুলতলা দিয়ে ফুটকীবাড়ি পার হয়ে পীরগঞ্জে পৌঁছেছে। আর একটি শাখা বীরগঞ্জ থেকে জগদল হয়ে কাহারোলে পৌঁছেছে। বীরগঞ্জ থেকে আরেকটি শাখা উত্তর-পূর্ব দিকে নিজপাড়াহাট হয়ে আরাজি গোবিন্দপুরের ভেতর দিয়ে আত্রাই নদী পার হয়ে খানসামায় পৌঁছেছে।

চ. দার্জিলিং-মুর্শিদাবাদ সড়কটি দশমাইল থেকে পূর্বদিকে সুন্দরপুর দিয়ে আত্রাই নদী পার হয়ে রাণীবন্দর-চম্পাতলী দিয়ে সৈয়দপুরে পৌঁছেছে। এই রাস্তার অপর একটি শাখা-রাস্তা নসরতপুরের উত্তরদিকে আলোকডিহি-পাকেরহাট-ভেরভেরী হয়ে খানসামায় পৌঁছেছে।

উক্ত রাস্তাগুলি দিনাজপুর জেলার যোগাযোগের প্রধান স্থলপথ। এছাড়াও অসংখ্য ছোট-বড় কাঁচা-পাকা রাস্তা দিনাজপুর জেলায় জালের মতো বিছিয়ে আছে। উল্লেখ্য যে, বর্ণিত রাস্তাগুলো মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনারাই বেশি ব্যবহার করতো। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন আড়াল পথে বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথগুলো ব্যবহার করতো। তবে পাকিস্তানি সেনাদের ব্যবহৃত বড় রাস্তাগুলোর উপর মুক্তিসেনাদের প্রায় সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ থাকতো।

রেলপথ: দিনাজপুরের পার্বতীপুর উত্তরবঙ্গের প্রধান রেলওয়ে জংশন। এই জংশন থেকে চারটি লাইন চারদিকে চলে গেছে। একটি উত্তর দিকে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে প্রবেশ করেছে, একটি দিনাজপুর সদরে এসেছে, একটি দক্ষিণদিকে হিলি হয়ে জয়পুরহাট জেলায় প্রবেশ করেছে এবং একটি উত্তর-পূর্বদিক দিয়ে খোলাহাটি হয়ে রংপুরে প্রবেশ করেছে। এছাড়াও দিনাজপুর শহরের পশ্চিমে কাঞ্চন জংশন থেকে একটি লাইন বের হয়ে বোচাগঞ্জ-পীরগঞ্জ-রুহিয়া হয়ে পঞ্চগড়ে প্রবেশ করেছে এবং অপর লাইনটি বিরল হয়ে ভারতের রাধিকাপুরে পৌঁছেছে।

হাট-বাজার: দিনাজপুর জেলার তেরোটি থানায় প্রচুর হাট-বাজার রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বড় বড় হাটগুলো পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ ও অত্যাচারে বন্ধ হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে ছোট-ছোট হাটগুলিতে জনগণ তাদের প্রয়োজন মেটাতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট হাটগুলো হচ্ছে: রেলবাজার হাট, খোসালডাঙ্গী হাট, বিরল হাট, বোর্ডহাট, কালিয়াগঞ্জ হাট, ডংডঙ্গির হাট, বালিবাড়ি হাট, কাজীপাড়া হাট, রামপুর হাট, চন্দহর হাট, ফুলবাড়ি হাট, নাড়াবাড়ি হাট, ধুকুরঝাড়ী হাট, দেওয়ানজিদীঘি হাট, বোচাগঞ্জ হাট, বকুলতলা হাট, মাহেরপুর হাট, সুলতানপুর হাট, উত্তর গোসাইপুর হাট, মঙ্গলপুর হাট, ঘুমটি হাট, হরেকৃষ্ণপুর হাট, সরস্বতীপুর হাট, বটতলী হাট, ডহনন্ডার হাট, কাহারোল হাট, দুমুখার হাট, নিজপাড়া হাট, সুজালপুর হাট, রসুলপুর হাট, কবিরাজের হাট, চৌরঙ্গী হাট, ফার্মের হাট, রাণীগঞ্জ হাট, পাকেরহাট, ঝাড়বাড়ি হাট, রামচন্দ্রপুর হাট, গোপালগঞ্জ হাট, সুন্দরবন হাট, রামডুবি হাট, গাবুরার হাট, সাহেবগঞ্জ হাট, মন্মথপুর হাট, ভবেরবাজার হাট, কাউগাঁর হাট, চিরিরবন্দর হাট, ফুলবাড়ি হাট, হিলি বাজারের হাট, নবাবগঞ্জ হাট, দাউদপুর হাট, বৈকুণ্ঠপুর হাট, মাদিলার হাট, চরকাই হাট, ভৈরব বাজারের হাট, গোদাগাড়ি হাট, শিকদার হাট, বড়গ্রাম হাট, কমলপুর হাট, দাইনুড়ের হাট, কুতইর

হাট, ফাসিলাডাঙ্গা হাট, ধামইর হাট, খানপুর হাট, নয়নপুর হাট, পলাশবাড়ি হাট, চকেরহাট, সাতোর হাট, কাটাবাড়ি হাট, বিন্নাকুড়ি হাট-সহ প্রভৃতি।

দিনাজপুরের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থানের পরিচিতি তুলে ধরা হলো:

কুঠিবাড়ি: তৎকালীন দিনাজপুর জেলা-সদরের ইপিআর হেডকোয়ার্টার থেকে ২৮ মার্চ ১৯৭১ বাঙালি ইপিআর জোয়ানেরা প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

দিনাজপুর সার্কিট হাউজ: ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সশস্ত্র ঘাঁটি। এছাড়াও এটি পাকিস্তানি সেনাদেরও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের যুদ্ধ পরিচালনা কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত।

দশমাইল: কাহারোল থানার অধীনে এটি একটি ত্রিমুখী রাস্তার সংযোগ-স্থল। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি ইপিআর এবং দিনাজপুরের জনগণ এখানে একটি 'শক্তিশালী ডিফেন্স' তৈরি করে সৈয়দপুর সেনাঘাঁটির আক্রমণ প্রতিহত করে। এছাড়াও নভেম্বর মাসের শেষে এবং ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ভুষিরবন্দর ব্রিজ: দিনাজপুর-সৈয়দপুর সড়কপথে দিনাজপুর ও চিরিরবন্দরের মধ্যকার সংযোগ-সেতু। এখানে পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এখানে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর ও মিত্রবাহিনীর কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

মোহনপুর ব্রিজ: দিনাজপুর সদর থেকে ফুলবাড়ি যাওয়ার পথে আত্রাই নদীর উপর এটি একটি অতীব জরুরি সেতু। পাকিস্তানি সেনাদের হাতে মোহনপুর সেতুটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এখানে পাকিস্তানিসেনাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি সংঘর্ষও হয়।

ভাতগাঁও ব্রিজ: দিনাজপুর-বীরগঞ্জ সড়কে এটি অবস্থিত। এই গ্রামের পাশে ঢেপা নদীর উপর বিখ্যাত ভাতগাঁও ব্রিজ। এখানে ১৯৭১ সালের ১৫ ও ১৬ নভেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সরাসরি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

কাঞ্চন ব্রিজ: দিনাজপুর রেলস্টেশন থেকে বিরল রেলপথে পুনর্ভবা নদীর উপর বহু পুরাতন ও একমাত্র রেলব্রিজ। ৭১-এর জুলাই ও ১৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের মুখোমুখি লড়াই হয় এবং ১৩ ডিসেম্বরে পলায়নপর পাকিস্তানি সেনারা সেতুটি ধবংস করে দেয়।

বহলা গ্রাম: ১১ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী বিরলের এই গ্রামের নিরীহ ছত্রিশ জন গ্রামবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এ গ্রামের একটি গণকবর তারই স্বাক্ষর বহন করছে। বিরলে মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকটি গেরিলা অভিযান পরিচালনা করে।

খানসামা: জেলার উল্লেখযোগ্য একটি থানা যেখানে পাকিস্তানি সেনারা একটি শক্তিশালী ঘাটি তৈরি করেছিল। এখানে ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী যৌথভাবে পাকিস্তানি সেনাদের যুদ্ধে পরাজিত করে।

বীরগঞ্জ: জেলার উল্লেখযোগ্য একটি থানা। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তার দোসররা নির্বিচারে নির্যাতন ও গণহত্যা চালিয়েছিল। এই থানার মদনপুর ও দেবীপুর মৌজায় বধ্যভূমি ও গণকবর রয়েছে। ৫ ও ৬ ডিসেম্বর উক্ত থানায় দুটো উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

সেতাবগঞ্জ: সেতাবগঞ্জ থানা উন্নয়ন কেন্দ্র প্রাঙ্গণে একটি পাকিস্তানি নির্যাতন ঘাঁটি ছিল; পরে তা বধ্যভূমিতে পরিণত হয়।

কাহরোল: এই থানায় পাকিস্তানি সেনা ও তার দোসররা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। এখানে বেশ কয়েকটি গণকবর রয়েছে। এই থানার কান্তনগরে যৌথ বাহিনীর একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল।

চিরিরবন্দর: এই থানায় ৭১-এর নভেম্বরের সূচনা থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এখানে কয়েকটি গণকবর রয়েছে।

পার্বতীপুর: পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসরদের অন্যতম শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। সেই সময়ে পার্বতীপুর শহর-এলাকা অবাঙালি অধ্যুষিত হওয়ায় এখানে স্মরণকালের অবর্ণনীয় নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছিল।

নবাবগঞ্জ: এই থানার উপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিভিন্ন সময়ে অকথ্য নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড চালায়। ৭১-এর ১০ অক্টোবর এই থানার চড়ারহাট ও আন্দল গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনী এক পৈশাচিক গণহত্যা সংঘটিত করে।

ঘোড়াঘাট: এখানে মুক্তিসংগ্রামের নয় মাসে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৭১-এর ১০ আগস্ট এই থানার কণাবাড়িতে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে একটি সফল যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ফুলবাড়ি: এই থানায় ৭১-এর নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরের ১৪ তারিখ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সফল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাছাড়া অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই থানার প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল।

হাকিমপুর: এই থানার হিলি বর্ডারকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী একটি উল্লেখ্যযোগ্য ডিফেন্স তৈরি করেছিল। ৭১ সালের ২০ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এখানে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১২ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী হিলি বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

উল্লেখ্য যে, দিনাজপুর জেলার তেরোটি থানায় যুদ্ধ সংঘটিত হলেও দিনাজপুর সদর-সহ সীমান্তবর্তী থানা বিরল ও হিলিতেই মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর দ্বারা বেশকিছু গেরিলা যুদ্ধ এবং বৃহৎ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধগুলোর মধ্যে সদর থানার খানপুর, বড়গ্রাম, ঘুঘুডাঙ্গা, রামসাগর; বিরলের কিশোরীগঞ্জ, ঠনঠনিয়া, বহবল দীঘি, বাজনাহার, কাঞ্চন ব্রিজ এবং হাকিমপুরের হিলি স্টেশন যুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও প্রতিটি থানার বেশকিছু গ্রামে, স্কুলে, জঙ্গলে, হাট-বাজারে, নদী-নালার পাড়ে, সেতুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে, রেলস্টেশনে- মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস কখনও গেরিলা কায়দায়, কখনও সম্মুখ-সমরে দিনাজপুরের মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছে। এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে তার উল্লেখ পাওয়া যাবে।

জেলার ইতিহাস

দিনাজপুর জেলা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১১২-১২০ ফুট গড় উচ্চতায় অবস্থিত। ভৌগোলিকভাবে এই জেলা ২৫°১৪' থেকে ২৫°৩৮' উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°০৫' থেকে ৮৫°২৮' দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। মোট ১৩টি উপজেলা নিয়ে গঠিত এই জেলার আয়তন ৩৪৩৭.৯৮ বর্গকিলোমিটার। ২০১১ সালের জনশুমারী অনুযায়ী এর মোট জনসংখ্যা ৩৩,১৫,২৩৮ জন। যার মধ্যে পুরুষ ১৬,৬১,৯৩৩ জন এবং মহিলা ১৬,৫৩,৩০৫ জন। উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত এই জেলার উত্তরে- ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়, দক্ষিণে- গাইবান্ধা ও জয়পুরহাট, পূর্বে- নীলফামারী ও রংপুর এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য।

লোকশ্রুতি অনুযায়ী জনৈক দিনাজ বা দিনারাজ, দিনাজপুর রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তার নামানুসারেই রাজবাড়ীতে অবস্থিত মৌজার নাম হয় দিনাজপুর। পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসনামলে ঘোড়াঘাট সরকার বাতিল করে ব্রিটিশরা নতুন জেলা গঠন করে এবং রাজার সম্মানে এই জেলার নামকরণ করে দিনাজপুর। কোম্পানী-আমলের নথিপত্রে সর্বপ্রথম দিনাজপুর নামটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে

ভৌগোলিকভাবে দিনাজপুর মৌজাটি অতি প্রাচীন। দিনাজপুরের ভূতপূর্ব কালেক্টর ও বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ মি. ওয়েষ্ট মেকট সর্বপ্রথম দিনাজপুর নামটি ও তার উৎস উদ্‌ঘাটন করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

ঐতিহাসিক বিবর্তন

দিনাজপুর জেলার বর্তমান আয়তন ৩৪৩৭.৯৮ বর্গকিলোমিটার। তবে পূর্বে এই জেলা আয়তনে ছিল সুবিশাল। পাল রাজবংশের চরম উন্নতির সময়ে দিনাজপুর সমগ্র রাজশাহী বিভাগ ও ঢাকা জেলার কীয়দংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। জেলারূপে ঘোষিত হওয়ার পরবর্তীতে এর বিস্তৃতি পূর্বের দিনাজপুর অপেক্ষা অনেক ছোট হয়েছে। ইংরেজ শাসনের প্রথমদিকেও মুসলিম রাজত্বের অংশ ছিল। ঐতিহাসিক বুকানন দিনাজপুর জেলার আয়তন ৫৩৭৪ বর্গমাইল বলে উল্লেখ করেছিলেন।

ইংরেজ আমলের মাঝামাঝির দিকে অর্থাৎ ১৭৫৭ হতে ১৮৬১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে পরিচালিত রাজস্ব জরিপে (Revenue Survey) এই সুবিশাল ভূভাগের আয়তন হ্রাস পেয়ে ৪,৫৪৩ বর্গমাইলে এসে দাঁড়ায়। [...] খ্রিষ্টাব্দে তা ৪,১৪২ বর্গমাইলে নেমে আসে এবং ইংরেজ শাসনের শেষের দিকে ৩,৯৪৬ বর্গমাইলে এসে দাঁড়ায়। শাসনকার্য প্রতিষ্ঠা এবং সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য ক্রমাগত এর আয়তন হ্রাস করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

১৮০০-১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে দিনাজপুরের কিছু বড় বড় এস্টেট পূর্নিয়া, রংপুর এবং রাজশাহী জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে আরও একটি সুবিস্তৃত অংশ বগুড়া ও মালদহ জেলার সাথে যুক্ত করার পূর্ব পর্যন্ত আর কোন রদবদল করা হয়নি।

১৮৬৪-১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে খট্টা নামক একটি সুবিশাল পরগণাকে এই জেলা হতে ছেঁটে বগুড়া জেলার সাথে যুক্ত করা হয়। ১৬৬৮-১৮৭০ সালের দিকে এই জেলার একটি বৃহৎ অংশ বগুড়া ও মালদহ জেলায় যুক্ত হয়। ১৮৯৭-১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে এই জেলার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত মহাদেবপুর থানা রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হয়। পাকিস্তান-পূর্ব-আমল পর্যন্ত আর কোন রদবদল হয়নি।

১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট, ইংরেজ-শাসিত ভারতের বুকে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি আলাদা রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করে। ঐ সময়ে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ-এর রেখা অনুসারে এই জেলার দশটি থানা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তা- পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গঠন করে। অপরদিকে পশ্চিম বাংলার জলপাইগুড়ি জেলা হতে তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়, বোদা, দেবীগঞ্জ ও পাটগ্রাম থানা দিনাজপুরের সাথে যুক্ত হয়। পরবর্তীতে শাসনকার্যের সুবিধার্থে পাকিস্তান সরকার পাটগ্রাম থানাটি রংপুরের সাথে এবং দিনাজপুরের দক্ষিণ অংশের ধামইর, পোরশা ও পত্নিতলা, এই তিনটি থানা তৎকালীন রাজশাহীর নওগাঁ মহকুমার সাথে যুক্ত

করে। সর্বশেষ ১৯৮৪ সালে দিনাজপুরের দুটি মহকুমা ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় আলাদা জেলার মর্যাদা লাভ করে।

দিনাজপুর শহরের গোড়াপত্তন

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের সূচনাকালে সৃষ্ট জেলাশহরগুলির অন্যতম ছিল দিনাজপুর। পলাশী যুদ্ধের আট বছর পর ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাবাহিনী অত্র এলাকা জয় করে। ফলে নবাবী শাসনের অবসান হয়, পতন হয় সাবেক রাজধানী ঘোড়াঘাট নগরের। এরপর গড়ে উঠতে শুরু করে দিনাজপুর শহর।

ইংরেজ-পূর্ব যুগে প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গ এলাকা নিয়ে নবাব-শাসিত ঘোড়াঘাট সরকারের (জেলা) ব্যাপ্তি ছিল এবং সরকারের শাসনাধিকরণ ছিল ঘোড়াঘাট নগর। এই সরকারের সর্বশেষ মুসলিম ফৌজদার মীর করম আলী, ইংরেজ সেনাপতি মি. কোট্রিল-এর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হোন। ফলে ঘোড়াঘাট নগর-সহ সমগ্র উত্তরাঞ্চল ইংরেজদের পদানত হয়। বিজয়ী কোম্পানি সরকার কর্তৃক উত্তরবঙ্গ শাসনের জন্য যে বৃহৎ জেলাটি গঠিত হয় (১৭৮৬), তার শাসনাধিকরণ বা জেলাশহর স্থাপিত হয় দিনাজপুর নামক মৌজায়। এই মৌজায় দিনাজপুর রাজবংশের রাজধানী ছিল প্রথমাবধি। সেই সূত্রে একই মোজীয় ইংরেজ আমলের জেলাশহরটিরও সুত্রপাত ঘটে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

দিনাজপুর গেজেটিয়ারের মতে, ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে জেলা-শাসনের জন্য দিনাজপুরে স্বতন্ত্র স্থায়ী কালেক্টরেট স্থাপিত হয়। মি. গেস্নজিয়ারের মতে, এর পূর্ব-পর্যন্ত দিনাজপুর ও রংপুর যুক্ত কালেক্টরেট ছিল। রাজসেরেস্তা থেকে নথিপত্র প্রত্যাহার করে জিলা স্কুলের পুরাতন ভবনটিতে (সম্প্রতি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে) আদি কালেক্টর অফিস স্থাপিত হয়। জিলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ভবনটি রাজকাচারী ছিল। তখন কালেক্টর ছিলেন মি. ম্যারিওয়েট। রাজা ছিলেন রাজবংশের নাবালক উত্তরাধিকারী রাজা রাধানাথ। তবে কোম্পানির চক্রান্তে নাবালক রাজার রাজজমিদারির ছিল চরম ছিন্নভিন্ন অবস্থা।

১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বিভাগ ও উপবিভাগ গঠিত হওয়ায় দিনাজপুর জেলার প্রথম নিয়মিত শাসননীতি প্রবর্তন করেন কালেক্টর মি. এইচ জে হ্যাচ। এইজন্যে গোলকুঠি চত্বরে স্থায়ী কালেক্টরেট ভবন নির্মিত হয় এবং নিয়মিত নথিপত্র প্রবর্তন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাও চালু হয়। গেজেটিয়ারের মতে, মি. হ্যাচ কঠোর সাম্রাজ্যবাদী, প্রভুত্ববাদী তথা ঝানু কূটবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। তারই ব্যবস্থাপনায় জেলায় প্রথম ব্রিটিশ-ধারার কাঠামো প্রচলিত হয়, যা আজ পর্যন্ত কালেক্টরেটকেন্দ্রিক শাসনের গতিধারায় প্রবহমান।

গেজেটিয়ারে প্রাপ্ত তথ্যমতে, মি. হ্যাচের আমলে দিনাজপুরে প্রথম নিজস্ব কালেক্টর ভবন নির্মিত হয় (১৭৮৬)। বাহাদুর বাজার এলাকায় অবস্থিত উক্ত ভবনের নাম ছিল 'গোলকুঠি প্রাসাদ'। মধ্যযুগের ইউরোপীয় স্থাপত্য ঢঙে নির্মিত এই প্রাসাদ দিনাজপুরের একটি বিশেষ নিদর্শন। মি. হ্যাচ ১৭৮৬-১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দিনাজপুর জেলার কালেক্টর ছিলেন। বিপত্নীক মি. হ্যাচ কেশরী বিবি নামক এক দেশীয় মেয়েকে বিয়ে করেন। প্রাসাদ-চত্বরের চারিদিকে নির্মিত হয় দিনাজপুরের প্রথম কালেক্টরেটের দাপ্তরিক ভবন।

দিনাজপুরে ইংরেজ শাসনের প্রবর্তন এবং জেলা কালেক্টরেট নির্মিত হওয়ায় আধুনিক জেলাশহরটির গঠন শুরু হয় রাজাদের দেয়া কয়েকটি মৌজার ওপর। রাজবাড়ি থেকে সমস্ত ইংরেজ নথিপত্র প্রত্যাহার করে গোলকুঠি ভবনে স্থানান্তর করা হয়। মোগল আমলের ঘোড়াঘাট নগর তখন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত।

দিনাজপুর শহর পৌরাণিক নদী পুনর্ভবার তীরে অবস্থিত। অবশ্য ভূতাত্ত্বিকভাবে শহরটি গড়ে উঠেছে ঘাঘরা নামক একটি মৃত নদীর গর্ভভূমির উপর। মৃত ঘাঘরা-গাবুরা-কাচাই প্রভৃতি নদী একসময় পুনর্ভবারই উপনদী ছিল। শহরটির সূচনাযুগে সেসব নদীর প্রবল স্রোতধারা বহমান ছিল। দিনাজপুর গেজেটিয়ারের মতে, ঘাঘরা-কাচাই (কাঁচমতি) ও গাবুরা (গর্ভেশ্বরী) নদী অভিন্ন সম্পর্কে জড়িত এবং প্রায় একই উৎস থেকে উৎপন্ন। শহরের উত্তর-প্রান্ত পর্যন্ত আগত এবং রাজবাড়ির পূর্বদিক হয়ে দক্ষিণদিকে ধাবমান মৃতপ্রায় নদীটির নাম গাবুরা বা গর্ভেশ্বরী। শহরের বুক চিরে অধুনা যে ক্ষীণকায় আধমরা ধারাটি পুনর্ভবায় মিলিত হয়েছে তা ঘাঘরা নামে পরিচিত।

মোগল আমলের ঘোড়াঘাটকে বলা হতো ৫২ পট্টি ও ৫৩ গলির শহর। তেমনি ব্রিটিশ-আমলের দিনাজপুর ছিল ৭ তলা ও ৮ পট্টির শহর। তলা অন্ত্যনামীয় মহল্লাগুলি হলো: নিমতলা, গনেশতলা, কালীতলা, ষষ্ঠিতলা, ফুলতলা, বকুলতলা ও লক্ষ্মীতলা। পট্টি অন্ত্যনামীয় মহল্লাগুলি হলো: মালদহপট্টি, ঢাকালপট্টি, চুড়িপট্টি, শাখারিপট্টি, কাঁয়াপট্টি, বাসুনিয়াপট্টি, চাউলিয়াপট্টি এবং ঠোঙ্গাপট্টি। বর্তমানে জেলাশহরটিতে মোট মহল্লার সংখ্যা ২৬টি। পূর্বের তুলনায় মহল্লার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তলা বা পট্টি অন্ত্যনামীয় কোন নতুন মহল্লা অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

দিনাজপুর গেজেটিয়ারে দেয়া বিবরণ মতে পুরাতন আমলের দিনাজপুর জেলাশহরটির সাধারণ পরিচয় ছিল নিম্নরূপ:

রাজগঞ্জ: শহরটির মূল এলাকা। এটি ছিল প্রধানত বাজার, বিপণি এবং ব্যবসায়ীদের লগ্নী-ব্যবসা ও বান্ধাই মজুদ ব্যবসার কেন্দ্রীভূত স্থান।

কাঞ্চনঘাট: পুনর্ভবা নদীর নিকটবর্তী শহরের পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকা। স্থানটির বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয়- পূর্বে এটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে (স্ট্রং

সাহেবের সময়, ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ) স্থানটিতে অবস্থাশালী উচ্চশ্রেণির লোকদের বাড়িঘর ও বাগান গড়ে ওঠে।

পাহাড়পুর: শহরের দক্ষিণাঞ্চলীয় এলাকা। এখানে বর্তমানে জেলখানা, হাসপাতাল, রেলস্টেশন, অফিস-আদালত এবং সরকারি কর্মচারীদের বাসস্থান গড়ে উঠেছে।

পুলহাট: শহরের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে রয়েছে অনেক ধানকল এবং ধান-চালের বড়-বড় আড়ত বা গোলাঘর। ধানকল ও গোলা-গুদামের আধিক্য থেকে মনে হয় প্রথম থেকেই এটি একটি শিল্প-এলাকারূপে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। এখানে একটি দ্বিসাপ্তাহিক বাজারও বসে।

শহরের অন্তর্ভুক্ত এইসব বিশিষ্ট এলাকা পরবর্তীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহল্লায় ভাগ হয়েছে। যেমন: রাজগঞ্জ এলাকার মধ্যে মুন্সিপাড়া, নিমতলা, গণেশতলা, ক্ষেত্রীপাড়া, কাঁয়াপট্টি, বাসুনিয়াপট্টি-সহ প্রভৃতি মহল্লার সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমদিকে নদীর তীরভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাটি ষষ্ঠিতলা, বালুয়াডাঙ্গা, ঘাসিপাড়া, চাউলিয়াপট্টি প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়েছে। জেলাশহরের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় গড়ে উঠেছে বালুবাড়ী, নিমনগর, খালপাড়া। মূলত ষষ্ঠিতলা, ঘাসিপাড়া, কালীতলা, বড়বন্দর, বালুবাড়ি এবং কিছু শহরতলী এলাকায় স্থানীয় ভদ্র পরিবারগুলির বাড়িঘর ঐ সময় থেকেই গড়ে উঠে। বড় মাঠের পশ্চিমে বর্তমান মিশন রোড মহল্লাটি প্রথম থেকেই সাহেববাড়ি মহল্লা নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে দিনাজপুর একটি বর্ধিষ্ণু শহর। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, একটি মেডিক্যাল কলেজ-সহ আধুনিক স্বাস্থ্য পরিসেবার সকল সুযোগ-সুবিধা আছে।

প্রাগ-ঐতিহাসিক দিনাজপুর

সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যমন্ডিত দিনাজপুরের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের ছোট নাগপুর, বিন্ধ্যাপর্বতের মতো লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাচীন স্থানগুলির মাটির সমগোত্রীয় দিনাজপুরের মাটি। বহুকাল-পূর্বে হিমালয় পর্বতের ভগ্নীরূপে জন্ম নেয়া বরেন্দ্রভূমির হৃদয়-স্থানীয় স্থান দিনাজপুর।

চৈনিক ও ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বিবরণীতে– বৃহৎ এবং সুনাব্য নদীরূপে বর্ণিত করোতোয়া নদীর তীরে কোন এক অজ্ঞাত সময় থেকেই একটি উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। করতোয়ার তীরে গড়ে উঠে বলে একে করতোয়া সভ্যতা হিসেবে অভিহিত করা যায়। অনুমেয় হয়, মধ্যযুগে মহাস্থানগড়, বাণগড় এবং মোগল যুগে দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট ছিল এই সভ্যতার প্রধান নাগরিক-কেন্দ্র। ইতিহাসখ্যাত পঞ্চনগরী দিনাজপুরেই অবস্থিত ছিল।

পাল ও সেন আমলে দিনাজপুর

যমুনা-করতোয়ার অববাহিকায় অবস্থিত এই নগরীর বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষগুলি চরকাই (বিরামপুর), চণ্ডীপুর, গড়সিংলাই, দামোদরপুর ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ নামে পরিচিত। মৎস্যন্যায় যুগে দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলায় করতোয়া নদীর পাড়ে এক উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধবিহার নির্মিত হয়। স্থাপত্যশৈলীর বিবেচনায় এটি বাংলাদেশে আবিষ্কৃত বৌদ্ধবিহারের মধ্যে তৃতীয় স্থানীয়। ১৯৬৮ সালে প্রথমবার এবং ১৯৭৩ সালে দ্বিতীয়বার খননের পর ৪১টি প্রকোষ্ঠ-সহ বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। এখানকার অনেক প্রত্নদ্রব্য দিনাজপুর মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। ৮ম শতকে গোড়াপত্তন হওয়া পাল বংশের ভ্রাম্যমাণ রাজধানীর বহু ধ্বংসাবশেষ দিনাজপুরের মাটিতে মিশে আছে। পাল রাজত্বকালে পার্বত্য কম্পোজ জাতির আক্রমণ এবং কৈবর্ত বিদ্রোহের ঘটনার সাথে জড়িয়ে আছে দিনাজপুর। সেন রাজত্বকালে নির্মিত অসংখ্য দেবদেবীর প্রস্তরমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে দিনাজপুর-সহ বরেন্দ্র অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায়।

আফগান ও মোগল আমলে দিনাজপুর

লক্ষণ সেনকে বিতাড়িত করে বিজেতা বখতিয়ার খলজী ১২০৪ সালে বরেন্দ্রভূমি বিজয় করে দিনাজপুরের দেবকোটে মুসলিম রাজধানী স্থাপন করেন। ১২২০ সালে গৌড়ে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্ব-পর্যন্ত দেবকোটই ছিল বাংলার রাজধানী।

চেহেলগাজীগণ দিনাজপুরের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাজা গোপালের সময় ইসলামের বার্তা নিয়ে চেহেলগাজীদের আবির্ভাব হয়। ন্যায়ের স্বার্থে রাজা গোপালের সেনাদলের সাথে ভয়ানক যুদ্ধে মুজাহিদগণ শহিদ হয়েও ভক্তদের মনে মহান গাজীত্বের সম্মান লাভ করেন। গাজীগণ সংখ্যায় চল্লিশ জন হওয়ায় তাদের ৫৪ ফুট দীর্ঘ সমাধিস্থলটি চেহেলগাজীর মাজার নামে পরিচিত; যা-দিনাজপুর শহরের উত্তর উপকণ্ঠে অবস্থিত। এছাড়াও দিনাজপুরের গড়মল্লিকপুর এবং খানসামার দুহশুহ গ্রামে যথাক্রমে ৮৪ ফুট এবং ৪৮ ফুট দীর্ঘ দুটি মাজার আছে যা যথাক্রমে গঞ্জে শহিদ এবং চেহেলগাজী নামে পরিচিত।

দিল্লি শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সুরক্ষায় ইলিয়াস শাহ কর্তৃক নির্মিত ঐতিহাসিক একডালা দুর্গের অবস্থানও ছিল দিনাজপুরের মধ্যেই। হত্যার রাজনীতির মাধ্যমে গৌড়ীয় সুলতাল গিয়াসউদ্দীন আযম শাহকে অপসারণ করে গৌড়ের মসনদে আরোহণকারী রাজা গণেশ দিনাজপুরের অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তীতে গণেশপুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালাল উদ্দিন নাম ধারণ করে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

গৌড়ীয় সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ-এর সেনাপতি শাহ ইসমাইল গাজী-এর নেতৃত্বে আত্রাই নদীর তীরবর্তী মাহিসন্তোষ নামক স্থানে কামতারাজের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং কামতাপুর দূর্গ (দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে) বিজিত হয়। ঘোড়াঘাটে করতোয়া নদীর পশ্চিমতীরে শাহ ইসমাইল গাজী এক মুসলিম নগরীর গোড়াপত্তন করেন। পরবর্তীতে ইহা বিখ্যাত 'ঘোড়াঘাট সরকার' নামে পরিচিত হয়। জিন্দাপীর নামে অভিহিত শাহ ইসমাইল গাজী ও বহু আউলিয়ার মাজার ঘোড়াঘাটে বিদ্যমান।

১৪৬০ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান বারবক শাহ সম্পাদিত এবং চেহেলগাজী মাজারে প্রাপ্ত একটি ফারসি শিলালিপি থেকে জানা যায়, দিনাজপুর শহর-সহ উত্তরাংশের শাসনতান্ত্রিক এলাকার শাসনকর্তা উলুঘ নুসরত খান চেহেলগাজী মাজারের পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যা বাংলাদেশের সর্বপ্রাচীন মসজিদ বলে চিহ্নিত। হোসেন শাহী আমলের বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলাম প্রচারকের মাজার দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট, দেবকোট-সহ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে। এছাড়াও দিনাজপুরের বুকে শেরশাহী আমলের মসজিদ, সড়ক ও সেতু, শূরবংশীয় অধিকারের প্রমাণ বহন করে।

মোগল আমলে বাংলা বিজয়ের পর সমগ্র বাংলাকে ১৯টি সরকারে এবং উড়িষ্যাকে ৫টি সরকারে ভাগ করা হয়। এতে দিনাজপুরে ঘোড়াঘাট, বরকাবাদ, তাজপুর এবং পিঞ্জরা নামের ৪টি সরকার অন্তর্ভুক্ত হয়। সবদিক বিবেচনায় বাংলার ঘোড়াঘাট শ্রেষ্ঠ সরকার ছিল। ঘোড়াঘাটের শেষ ফৌজদার ছিলেন ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মোজাফফরনামা' রচয়িতা করম আলী খান। সে সময় মসজিদ ও মুসলিম নগরীতে পরিণত হয় মোগল আমলের ঘোড়াঘাট। বিখ্যাত সুরা মসজিদ ও আউলিয়াদের মাজারে ধন্য হয় ঘোড়াঘাট।

দিনাজপুর রাজপরিবার

লোকশ্রুতি অনুযায়ী জনৈক দিনাজ বা দিনারাজ দিনাজপুর রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তার নামানুসারেই দিনাজপুর জেলার নামকরণ করা হয়। মোগল সম্রাট আকবরের শাসনামলে ব্রহ্মচারী ও মোহন্ত হিসেবে পরিচিত কাশী ঠাকুর নামক একজন সন্ন্যাসী দিনাজপুর ও মালদা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অধিকারী হোন। তিনি নিজেকে রাজা গণেশের বংশধর বলে দাবি করতেন। জানা যায়, তিনি তার সমস্ত সম্পত্তি তার প্রিয়ভাজন কায়স্তশিষ্য শ্রীমন্ত দত্ত চৌধুরীকে উইল করে দিয়ে যান। পরবর্তীতে এই সম্পত্তি শ্রীমন্তের দৌহিত্র শুকদেব রায় উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন। শুকদের রংপুর, বগুড়া ও মালদার অংশবিশেষে প্রতিষ্ঠিত জমিদারি

পেয়েছিলেন। তিনি এই জমিদারি দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও-এর অন্তর্ভুক্ত নবাবপুর, ক্ষেতলাল, শিবগঞ্জ, পাঁচবিবি, বদলগাছি ও আদমদিঘি অঞ্চলে সম্প্রসারণ করেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেব শুকদেব রায়ের বিশাল জমিদারি বিবেচনা করে ১৬৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তাকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৬৮২ খ্রিষ্টাব্দে তার কনিষ্ঠপুত্র প্রাণনাথ রায় তার স্থলাভিষিক্ত হোন। তিনিই ছিলেন পরিবারের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং ক্ষমতাবান ব্যক্তি। প্রাণনাথ ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে কান্তনগরে পোড়ামাটির অলঙ্করণসমৃদ্ধ অসাধারণ কান্তজিউ মন্দিরের (নবরত্ন মন্দির নামেও পরিচিত) নির্মাণকাজ শুরু করেন। তবে তিনি জীবদ্দশায় এই মন্দিরের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। মন্দিরটি নির্মাণ করতে প্রায় আটচল্লিশ বছর সময় লেগেছে। ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে তার যোগ্য উত্তরসূরি (দত্তকপুত্র) রামনাথ রায় এটি সম্পন্ন করেন। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ভয়াবহ ভূমিকম্পে কান্তজিউ মন্দির ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। পরবর্তীতে মহারাজা গিরিজানাথ রায়বাহাদুর মন্দিরটির সংস্কার করেন। তার পালকপুত্র জগদীশনাথ রায়ের আমলে ইস্ট-বেঙ্গল এস্টেট অ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট-১৯৫০ অনুসারে এই জমিদারি বিলুপ্ত হয়। ১৯৬২ সাথে কলকাতায় জগদীশনাথ মৃত্যুবরণ করেন।

দিনাজপুরে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি মি. কোট্রিল ঘোড়াঘাটের শেষ মুসলিম ফৌজদার করম আলী খানকে পরাজিত করে এই অঞ্চলে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এই অঞ্চলে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে ইংরেজরা ১৭৮৬ সালে নতুন জেলা গঠন করে। ১৭৯৩ সালে দিনাজপুরে এই জেলার দপ্তর স্থাপন করা হয়। ১৮৩৩ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত দিনাজপুরের বিভিন্ন অংশ পূর্ণিয়া, রংপুর ও রাজশাহীর মধ্যে অন্তর্ভুক্তি ও বিচ্যুতি ঘটে। দিনাজপুরের কালেক্টর মি. এইচ. জে হ্যাচ (১৭৮৬ থেকে ১৭৯৩ পর্যন্ত কালেক্টর ছিলেন)-এর আমলে দিনাজপুরে সর্বপ্রথম নিজস্ব কালেক্টরেট ভবন নির্মিত হয় বর্তমান বাহাদুর বাজারস্থ গোলকুঠি বাড়িতে।

জেলার প্রশাসনিক বিন্যাস

বর্তমানে ১৩টি উপজেলার সমন্বয়ে দিনাজপুর জেলা গঠিত। এই জেলার মোট ইউনিয়নের সংখ্যা ১০১টি, পৌরসভা আছে ৮টি এবং মৌজার সংখ্যা ২,০২০টি।

সংক্ষিপ্ত উপজেলা পরিচিতি

বর্তমানে ১৩ টি উপজেলার সমন্বয়ে দিনাজপুর জেলা গঠিত।

ক্রমিক	নাম	আয়তন (বর্গকিলোমিটার)	জনসংখ্যা	জেলা শহরের যেদিকে	জেলাশহর থেকে দূরত্ব
০১	বিরল	৩৫২.১৫	২৩১৪৭৬	পশ্চিম	১২ কিমি
০২	বোচাগঞ্জ	২২৪.৮১	১৩৫৩৭৬	পশ্চিম	২৫ কিমি
০৩	কাহারোল	২০৫.৫৪	১১৮৩৭৯	উত্তর-পশ্চিম	২৫ কিমি
০৪	বীরগঞ্জ	৪১৩.০০	১৬৯৮৯৩	উত্তর-পশ্চিম	৩০ কিমি
০৫	খানসামা	১৭৯.৭২	১২৩৭৮২	উত্তর	৩৫ কিমি
০৬	দিনাজপুর সদর	৩৫৪.৩৪	৩৫৭৮৮৮	উত্তর	০৬ কিমি
০৭	চিরিরবন্ধর	৩০৮.৬৮	২৩২৪০৯	উত্তর-পূর্ব	১৫ কিমি
০৮	পার্বতীপুর	৩৯৫.১০	২৭০৯০৪	উত্তর-পূর্ব	২৫ কিমি
০৯	ফুলবাড়ি	২২৯.৫৫	১২৯৪৩৫	পূর্ব	৪০ কিমি
১০	বিরামপুর	২১১.৮১	১৩৪৭৭৮	পূর্ব	৬০ কিমি
১১	নবাবগঞ্জ	৩১৪.৬৮	১৭০৩০১	পূর্ব	৭০ কিমি
১২	হাকিমপুর	৯৯.৩২	৬৬৮৭৬	দক্ষিণ-পূর্ব	৭৫ কিমি
১৩	ঘোড়াঘাট	১৪৮.৬৭	৮৪২৭৯	পূর্ব	১০০ কিমি

দিনাজপুর জেলার সংক্ষিপ্ত তথ্য

বীরগঞ্জ: বীরগঞ্জ উপজেলার মোট আয়তন ৪১৩ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে- ঠাকুরগাঁও সদর ও দেবীগঞ্জ উপজেলা; দক্ষিণে- কাহারোল উপজেলা; পূর্বে- খানসামা উপজেলা; পশ্চিমে- বোচাগঞ্জ, পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও) ও ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা। প্রধান নদী আত্রাই ও পুনর্ভবা। প্রধান বিল পাইসা, লাল এবং চন্দ্রগোভার। ১৮৭৩ সালে বীরগঞ্জ থানা সৃষ্টি হয় এবং এই থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। বীরগঞ্জ উপজেলায় পৌরসভা ১টি (বীরগঞ্জ পৌরসভা), ইউনিয়ন ১১টি, মৌজা ১৮৭টি এবং গ্রাম ১৮৬টি। এই উপজেলায় মোট জনসংখ্যা ২৬৯৮৯৩ জন; যার মধ্যে পুরুষ ৫১.২৩%, মহিলা ৪৮.৭৭%। মুসলমান ৬৯.২০%, হিন্দু ২৮.৩৮%, বৌদ্ধ ১.১২%, খ্রিষ্টান ০.০৪% এবং অন্যান্য ১.২৬%। উল্লেখ্য বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান এবং অনান্য জাতিসত্তার মানুষজনের মধ্যে অধিকাংশই আদিবাসী।

বীরগঞ্জ উপজেলা তেভাগা আন্দোলন এবং সাঁওতাল বিদ্রোহের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখানকার জনগণ মুক্তিযুদ্ধ-সহ অনেক ঐতিহাসিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

কাহারোলঃ কাহারোল উপজেলার মোট আয়তন ২০৫.৫৪ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে- বীরগঞ্জ উপজেলা; দক্ষিণে- দিনাজপুর সদর ও বিরল উপজেলা; পূর্বে- খানসামা ও দিনাজপুর সদর উপজেলা; পশ্চিমে- বোচাগঞ্জ উপজেলা। প্রধান নদী পুনর্ভবা, আত্রাই এবং ঢেপা নদী। কাঞ্চন ও হাঁস-বিল উল্লেখযোগ্য। ১৯০৪ সালে কাহারোল থানা সৃষ্টি হয় এবং সেই থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৪ সালে। কাহারোল উপজেলায় ইউনিয়ন ০৬টি, মৌজা ১৫৩টি এবং গ্রাম ১৫২টি। এই উপজেলায় মোট জনসংখ্যা ১১৮৩৭৯ জন। যার মধ্যে পুরুষ ৫১.৭৭%, মহিলা ৪৮.২৩%। মুসলমান ৫২.৯৩%, হিন্দু ৪৪.৯০%, খ্রিষ্টান ০.৬২% এবং অন্যান্য ১.৫৫%। উল্লেখ্য খ্রিষ্টান এবং অনান্য জাতিসত্তার মানুষজনের মধ্যে অধিকাংশই আদিবাসী।

১৯৭১ সালে মদনপুর গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকিস্তানিবাহিনীর যুদ্ধ হয়। এতে কিছু পাকিস্তানিসেনা নিহত হয় এবং বাকিরা পালিয়ে যায়। আব্দুল আওয়াল নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা এই যুদ্ধে নিহত হয়।

বোচাগঞ্জঃ বোচাগঞ্জ উপজেলার মোট আয়তন ২২৪.৮১ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে- বীরগঞ্জ এবং পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও) উপজেলা; দক্ষিণে- বিরল উপজেলা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ; পূর্বে- বীরগঞ্জ, কাহারোল এবং বিরল উপজেলা; পশ্চিমে- পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও) উপজেলা। প্রধান নদী টাঙন। বোচাগঞ্জ থানা সৃষ্টি হয় ১৯১৫ সালে এবং সেই থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৪ সালে। বোচাগঞ্জ উপজেলায় পৌরসভা ০১টি (সেতাবগঞ্জ পৌরসভা), ইউনিয়ন ০৬টি, মৌজা ১৪৪টি এবং গ্রাম ১৪৬টি। এই উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১৩৫৩৭৬ জন। যার মধ্যে পুরুষ ৫১.৭৭%, মহিলা ৪৮.২৩%। মুসলমান ৬০.২৪%, হিন্দু ৩৭.৭৫%, খ্রিষ্টান ০.৪৯% এবং অন্যান্য ১.৫২%। খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য জাতিসত্তার মানুষজনের উৎস বিবেচনা করলে এদের মধ্যে অধিকাংশ প্রকৃতিবাদী ধর্মজাত।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এই উপজেলার মাহেরপুর হাটে মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি সেনাদের যুদ্ধ হয়। এই সময় পাকিস্তানি বাহিনী পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রাম ভস্মীভূত করে।

বিরল: বিরল উপজেলার মোট আয়তন ৩৫২.১৬ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে- বোচাগঞ্জ এবং কাহারোল উপজেলা; দক্ষিণে- দিনাজপুর সদর উপজেলা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ; পূর্বে- দিনাজপুর সদর উপজেলা; পশ্চিমে- ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। প্রধান নদী পুনর্ভবা, তুলাই ও টাঙন। কড়াই বিল ও নলদিঘি ও দেওয়ানজিদিঘি উল্লেখযোগ্য। বিরল থানা সৃষ্টি হয় ১৯১৫ সালে এবং সেই থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৪ সালে। বিরল উপজেলায় পৌরসভা ০১টি (বিরল পৌরসভা), ইউনিয়ন ১০টি, মৌজা ২৪১টি এবং গ্রাম ২৩৮টি। এই উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২৩১৪৭৬ জন। যার মধ্যে পুরুষ ৫১.৭৫%, মহিলা ৪৮.২৫%। মুসলমান ৬০.২৪%, হিন্দু ৩৭.৭৫%, খ্রিষ্টান ০.৪৮% এবং অন্যান্য ১.৫৩%। খ্রিষ্টান ও অন্যান্যদের সকলেই আদিবাসী উৎসজাত।

৭১-এর ১৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী বিরলের বহলা গ্রামের ছত্রিশ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং কাঞ্চন রেলব্রিজটি ধবংস করে দেয়।

দিনাজপুর সদর: দিনাজপুর সদর উপজেলার মোট আয়তন ৩৫৪.৩৪ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে- কাহারোল এবং খানসামা উপজেলা; দক্ষিণে- ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, পূর্বে- চিরিরবন্দর উপজেলা; পশ্চিমে- বিরল উপজেলা। প্রধান নদী ঢেপা, পুনর্ভবা, গর্ভেশ্বরী ও আত্রাই। দিনাজপুর সদর থানা সৃষ্টি ১৮৯৯ সালে এবং সেই থানাকে উপজেলা করা হয় ১৯৮৩ সালে। দিনাজপুর সদর উপজেলায় পৌরসভা ১টি (দিনাজপুর সদর), ইউনিয়ন ১০টি, মৌজা ২৯১টি এবং গ্রাম ২০৫। এই উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৪৮৪৫৯৭ জন; যার মধ্যে পুরুষ ২৪৭৭৯২ জন (৫১.১৩%), মহিলা ২৩৬৮০৫ জন (৪৮.৮৭%)। মুসলমান ৩৯৮১৫৫ জন (৮২.১৬%), হিন্দু ৭৮০১৮ জন (১৬.০৯%), খ্রিষ্টান ৫৩৯২ জন (১.১১%), এবং অন্যান্য ২৯৭১ জন (০.৬১%)। খ্রিষ্টান ও অন্যান্যদের সকলেই আদিবাসী উৎসজাত।

মহান মুক্তিযুদ্ধে ২৭ মার্চ ১৯৭১, দিনাজপুর কুঠিবাড়ীর পতন হয় এবং দিনাজপুর শহর ১৪ এপ্রিল ১৯৭১ পর্যন্ত মুক্তাঞ্চল হিসেবে টিকে ছিল। ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১, বড়মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

খানসামা: খানসামা উপজেলার মোট আয়তন ১৭৯.৭২ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে- দেবীগঞ্জ ও নীলফামারী সদর উপজেলা; দক্ষিণে- চিরিরবন্দর ও দিনাজপুর সদর উপজেলা; পূর্বে- নীলফামারী সদর উপজেলা; পশ্চিমে- কাহারোল ও বীরগঞ্জ উপজেলা। প্রধান নদী আত্রাই ও আপার করতোয়া। খানসামা থানা সৃষ্টি হয় ১৮৯১ সালে এবং সেই থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। খানসামা

উপজেলায় ইউনিয়ন ০৬টি, মৌজা ৫৭টি এবং গ্রাম ৫৭টি। খানসামা উপজেলার জনসংখ্যা ১২৩৭৮২ জন; যার মধ্যে পুরুষ ৫১.৭৭%, মহিলা ৪৮.২৩%। মুসলমান ৬৯.৯১%, হিন্দু ২৯.৭৫% এবং অন্যান্য ০.৩৪%। উল্লেখ্য খ্রিষ্টান ও অনান্য জাতিসত্তার মানুষজনের মধ্যে অধিকাংশই আদিবাসী।

মুক্তিযুদ্ধের সময় সুবেদার মজিদের নেতৃত্বে আত্রাই নদীর তীরে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকিস্তানি সেনাদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সুবেদার মজিদ নিহত হোন।

চিরিরবন্দর: চিররিবন্দর উপজেলার মোট আয়তন ৩০৮.৬৮ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে- খানসামা উপজেলা; দক্ষিণে- ফুলবাড়ি উপজেলা ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ; পূর্বে- পার্বতীপুর উপজেলা; পশ্চিমে- দিনাজপুর সদর উপজেলা। প্রধান নদী ছোট যমুনা ও আত্রাই । চিরিরবন্দর থানা সৃষ্টি হয় ১৯১৪ সালে এবং সেই থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা ১৯৮৪ সালে। চিরিরবন্দর উপজেলায় ইউনিয়ন ১২টি, মৌজা ১৪৫টি, গ্রাম ১৪১টি। এই উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২৩২৪০৯ জন; যারমধ্যে পুরুষ ৫১.৭৭%, মহিলা ৪৮.২৩%। মুসলমান ৭৫.১৮%, হিন্দু ২৩.৭৭% এবং অন্যান্য ০.৮১% । উল্লেখ্য অনান্য জাতিসত্তার মানুষজনের মধ্যে অধিকাংশই আদিবাসী।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় দশমাইল নামক স্থানে পাকিস্তানিসেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে এক সংঘর্ষে মুক্তিযোদ্ধা মাহাতাব বেগ শহিদ হোন। পাকিস্তানি সেনারা তার মস্তক ছিন্ন করে নিয়ে যায়।

পার্বতীপুর: পার্বতীপুর উপজেলার মোট আয়তন ৩৯৫.১০ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে- সৈয়দপুর উপজেলা; দক্ষিণে- ফুলবাড়ি উপজেলা; পূর্বে- বদরগঞ্জ উপজেলা; পশ্চিমে- চিরিরবন্দর উপজেলা। প্রধান নদী খরখড়ি ও ছোট যমুনা। পার্বতীপুর থানা সৃষ্টি হয় ১৮০০ সালে এবং সেই থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। পার্বতীপুর উপজেলায় পৌরসভা ১টি (পার্বতীপুর পৌরসভা), ইউনিয়ন ১৩টি, মৌজা ১৯৪টি, গ্রাম ২৩০টি। এই উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২৭০৯০৪ জন; যার মধ্যে পুরুষ ৫১.৪৬%, মহিলা ৪৮.৫৪%। মুসলমান ৮৪.৪৯%, হিন্দু ১৩.৮৬%, খ্রিষ্টান ০.৪১% এবং অন্যান্য ১.২৪%। এই উপজেলায় প্রায় ৩০৮ টি সাঁওতাল পরিবার রয়েছে এর পাশাপাশি খ্রিষ্টান ও অন্যান্য জাতিসত্তার অধিকাংশ মানুষজনই আদিবাসীভুক্ত।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় ভারত থেকে অনেক অবাঙালি মুসলমান পার্বতীপুরে এসে বসতি গড়ে তোলে। পাকিস্তান আমলে এই জনগোষ্ঠী আধিপত্য

বিস্তারে সক্ষম হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানকার উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী পাকিস্তানি সেনাদের সাথে মিলিত হয়ে প্রচুর বাঙালি হত্যা করে।

ফুলবাড়িঃ ফুলবাড়ি উপজেলার মোট আয়তন ২২৯.৫৫ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে- পার্বতীপুর ও চিরিরবন্দর উপজেলা; দক্ষিণে- বিরামপুর উপজেলা; পূর্বে- নবাবগঞ্জ উপজেলা ও বিরামপুর উপজেলা; পশ্চিমে- ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। ছোট যমুনা হলো উল্লেখযোগ্য নদী। ফুলবাড়ি থানা সৃষ্টি হয় ১৮৫৭ সালে এবং সেই থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৪ সালে। ফুলবাড়ি উপজেলায় পৌরসভা ১টি (ফুলবাড়ি পৌরসভা), ইউনিয়ন ১০টি, মৌজা ১৭০টি, গ্রাম ১৫০টি। এই উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১২৯৪৩৫ জন; যার মধ্যে পুরুষ ৫১.৭৭%, মহিলা ৪৮.২৩%। মুসলমান ৮১.৫৪%, হিন্দু ১৪.৭৫%, খ্রিষ্টান ০.৬০% ও অন্যান্য ৩.১১%। উল্লেখ্য খ্রিষ্টান ও অন্যান্য জাতিসত্তার অধিকাংশ মানুষজনই আদিবাসীভুক্ত।

বিরামপুরঃ বিরামপুর উপজেলার মোট আয়তন ২১১.৮১ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে- ফুলবাড়ি ও নবাবগঞ্জ উপজেলা; দক্ষিণে– হাকিমপুর উপজেলা ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বে- নবাবগঞ্জ ও হাকিমপুর উপজেলা, পশ্চিমে- ফুলবাড়ি উপজেলা ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। নদীর মধ্যে ছোট যমুনা এবং বিলের মধ্যে আশুরার বিল হলো প্রধান। বিরামপুর থানা গঠিত হয় ১৭ জুন ১৯৮১ এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। বিরামপুর উপজেলায় পৌরসভা ১টি (বিরামপুর পৌরসভা), ইউনিয়ন ৭টি, মৌজা ১৭১টি, গ্রাম ১৮৯টি। এই উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১৩৪৭৭৮ জন; যার মধ্যে পুরুষ ৫১.৬০%, মহিলা ৪৮.৪০%। মুসলমান ৮৮.২৭%, হিন্দু ৭.১৬%, খ্রিষ্টান ২.৩২% এবং অন্যান্য ২.২৫%। উল্লেখ্য খ্রিষ্টান ও অন্যান্য জাতিসত্তার অধিকাংশ মানুষজনই আদিবাসীভুক্ত।

১৯৭১ সালে কাটলা হাটে মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তানি সেনাদের সম্মুখযুদ্ধে ৭ জন পাকিস্তানি সেনা ও ১৬ জন মুক্তিযোদ্ধা মারা যায়।

নবাবগঞ্জঃ নবাবগঞ্জ উপজেলার মোট আয়তন ৩১৪.৬৮ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে– ফুলবাড়ি উপজেলা; দক্ষিণে– ঘোড়াঘাট ও হাকিমপুর উপজেলা; পূর্বে- রংপুর জেলার পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর ও বদরগঞ্জ উপজেলা, পশ্চিমে- বিরামপুর ও ফুলবাড়ি উপজেলা। করতোয়া, যমুনেশ্বরী ও তুলসীগঙ্গা নদী এবং আশুড়ার বিল উল্লেখযোগ্য। নবাবগঞ্জ থানা সৃষ্টি হয় ১৮৯৯ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। নবাবগঞ্জ উপজেলায় ইউনিয়ন ৯টি, মৌজা ২১২টি এবং গ্রাম ২৭১টি। এই উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১৭০৩০১ জন; যার মধ্যে

পুরুষ ৫১.৭৭%, মহিলা ৪৮.২৩%। মুসলমান ৮৬.৪৮%, হিন্দু ৮.০৫%, খ্রিষ্টান ১.২২% এবং অন্যান্য ৪.২৫%। উল্লেখ্য খ্রিষ্টান ও অন্যান্য জাতিসত্তার অধিকাংশ মানুষজনই আদিবাসীভুক্ত।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিবাহিনী মতিহারা ও চড়ারহাট এলাকার প্রায় ৪০ জন স্থানীয় লোককে হত্যা করে।

হাকিমপুর: হাকিমপুর উপজেলার মোট আয়তন ৯৯.৯২ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে- নবাবগঞ্জ ও বিরামপুর উপজেলা, দক্ষিণে- পাঁচবিবি উপজেলা; পূর্বে- ঘোড়াঘাট উপজেলা; পশ্চিমে- বিরামপুর উপজেলা ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। প্রধান নদী ছোট যমুনা ও তুলসীগঙ্গা। হাকিমপুর থানা সৃষ্টি হয় ১৯৫০ সালে এবং সেই থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৪ সালে। হাকিমপুর উপজেলায় পৌরসভা ১টি (হাকিমপুর পৌরসভা), ইউনিয়ন ৪টি, মৌজা ৬৯টি এবং গ্রাম ৯১টি। এই উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৬৬৮৭৬ জন; যার মধ্যে পুরুষ ৫১.৭৭%, মহিলা ৪৮.২৩%। মুসলমান ৯১.৫৬%, হিন্দু ৬.২৭%, খ্রিষ্টান ১.০৪% এবং অন্যান্য ১.১৩%। উল্লেখ্য খ্রিষ্টান ও অন্যান্য জাতিসত্তার অধিকাংশ মানুষজনই আদিবাসীভুক্ত।

১৯৭১ সালে হিলি ছিল মুক্তিযুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গন। মুক্তিযোদ্ধারা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সাথে যোগাযোগের পথ হিসেবে একে ব্যবহার করে এবং পরবর্তীতে এই পথে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। হিলিতে মক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় মিত্রবাহিনীর অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

ঘোড়াঘাট: ঘোড়াঘাট উপজেলার আয়তন ১৪৮.৬৭ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে- নবাবগঞ্জ ও পীরগঞ্জ (রংপুর) উপজেলা; দক্ষিণে- পাঁচবিবি ও গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা; পূর্বে- পলাশবাড়ি ও পীরগঞ্জ (রংপুর), পশ্চিমে– হাকিমপুর ও নবাবগঞ্জ উপজেলা। প্রধান নদী করতোয়া। লালাদহ বিল উল্লেখযোগ্য। ঘোড়াঘাট থানা সৃষ্টি হয় ১৮৯৫ সালে এবং সেই থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৪ সালে। ঘোড়াঘাট উপজেলায় পৌরসভা ১টি (ঘোড়াঘাট পৌরসভা), ইউনিয়ন ৪টি, মৌজা ১১টি এবং গ্রাম ১১১টি। এই উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৮৪২৭৯ জন; যার মধ্যে পুরুষ ৫১.৭৭%, মহিলা ৪৮.২৩%। মুসলমান ৮৬.৭৭%, হিন্দু ৭.২৭%, খ্রিষ্টান ১.৯৭% এবং অন্যান্য ৩.৯৯%। খ্রিষ্টান ও অন্যান্য জাতিসত্তার অধিকাংশ মানুষজনই আদিবাসীভুক্ত।

জেলার সীমান্ত তথ্য

দিনাজপুরের পশ্চিমে– ভারতের সীমান্ত রয়েছে। দিনাজপুর জেলার ৭টি উপজেলার সাথে রয়েছে ভারতীয় সীমান্ত। ফুলবাড়ি ও হাকিমপুর উপজেলার পশ্চিমে; চিরিরবন্দর, বোচাগঞ্জ ও দিনাজপুর সদর উপজেলার দক্ষিণে; বিরামপুর ও বিরল উপজেলার দক্ষিণে ও পশ্চিমে রয়েছে ভারতীয় সীমান্ত।

১৯৪৭-পূর্ব প্রতিরোধের ঐতিহ্য

বহু প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার মানুষ সংঘবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তাদের সমাজ ছিল, রাজা ছিল, ছিল রাষ্ট্র। আরও আগে এদেশে যখন আনুষ্ঠানিক রাজতন্ত্র ছিল না, তখন গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত সমাজেও একটি শাসনব্যবস্থা তথা একটি নিয়ম পালনের প্রথা ছিল। সময়ের পরিবর্তন এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে পৃথিবীতে যেমন রাজতন্ত্র ও রাষ্ট্রতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি সভ্যতা বিকাশের সেই ক্রমবিবর্তনে গণমানুষের বাঁচার অধিকারের ক্ষেত্র হিসাবে তৈরি হয়েছে প্রতিরোধের ঐতিহ্য। দিনাজপুরেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

১৯৪৭-পূর্ব প্রতিরোধের ঐতিহ্যের দিকে তাকালে দেখা যাবে- প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বকাল পর্যন্ত দিনাজপুরে সংঘটিত হয়েছে নানা ধরনের আন্দোলন, বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের সংগ্রাম। যা- শেষ পর্যন্ত জেলার গৌরবময় ঐতিহ্যে রূপান্তরিত হয়েছে।

পাল নৃপতিদের রাজত্বকালের নানাবিধ প্রাচীন-লিপি দিনাজপুর জেলায় আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই থেকে পাল রাজত্বের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি। সেই সময় পাল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজাবিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়- সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত *রাম চরিত*-এর বর্ণনায়। মহীপালের শাসনামলে প্রজাবিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তৎকালীন অত্যাচারী রাজা দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হোন। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, প্রাচীনকাল থেকে দিনাজপুরবাসী অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ছিল। যদিও দিনাজপুরের সাধারণ মানুষ আচার-আচরণে, স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে অত্যন্ত নম্র, ভদ্র এবং সরল; কিন্তু প্রতিবাদ-সংগ্রামের মূল জায়গাটিতে তারা সবসময় সম্মুখে অবস্থান করে। এটিও দিনাজপুরের মানুষের আরও একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এরপর মদন পালদেবের রাজ্য শাসনের মধ্য দিয়ে দিনাজপুরে পাল সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ঘটলেও সেন-শাসন প্রতিষ্ঠার তেমন কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তীতে রাজা লক্ষণ সেনের শাসনামলের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কী সেনাপতি বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের মধ্য দিয়ে দিনাজপুরেও সেন শাসনের অবসান

ঘটে এবং সেসময় থেকেই মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা পায়। আমরা জানি হোসেন শাহী বংশের পতনের মধ্য দিয়ে বাংলায় মোগল সাম্রাজ্যের অভিযান শুরু হয়। কিন্তু মোগলরাও দিনাজপুরের মাটিতে নির্বিঘ্নে শাসনকার্য চালিয়ে যেতে পারেনি। কারণ ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ঘোড়াঘাটের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধপটু পাঠান সর্দারেরা মোগলদের সাথে বহু খন্ড-খন্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যা থেকে ঘোড়াঘাটের স্বাধীনতার অস্তিত্ব রক্ষায় দিনাজপুরবাসী এক প্রতিরোধের ঐতিহ্য গড়ে তোলে। খেয়াল করলেই দেখা যাবে- পাঠানেরা স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তায় বিশাল মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে তৎকালীন দিনাজপুরের খাল-বিল ও ঝিলে পরিপূর্ণ জলা-জঙ্গলভূমিতে অভিনব রণকৌশলে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। যা আজকের দিনে গেরিলা যুদ্ধের সমপর্যায়ভুক্ত।

বাদশা আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দ) পর- মোগল সাম্রাজ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ফলে বাংলার বহু অংশ তৎকালীন সময়ের সুবেদারদের দ্বারা স্বঘোষিত স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। এই সময়টি নবাবী আমল নামে পরিচিত। সুতরাং দিনাজপুরও অনুরূপ স্বাধীনতা ভোগ করেছে। সেই সময়ে ঘোড়াঘাট, পঞ্চগড়, তাজপুর, পূর্ণিয়া, জান্নাতাবাদ প্রভৃতি এলাকা নিয়ে দিনাজপুর জমিদারি গঠিত হয়েছিল। তৎকালীন মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক নিযুক্ত চাকলাদার ছিলেন দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথ রায়।

সময়ের গতি ও ইতিহাসের বিবর্তনে ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে মোগল সম্রাট বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে হস্তান্তর করলে ঐ সময় থেকে দিনাজপুরের জমিদারি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বেড়াজালে যখন দেশীয় রাজা, জমিদার, নেতা আপন আপন স্বার্থের মোহে তোষণ-নীতির আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করছে, তখনও সমগ্র বাংলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে অনড় ভূমিকায় দিনাজপুরের রাজবংশ ও জনসাধারণ। এই রাজবংশ প্রায় ৫০ বছর যাবৎ প্রকাশ্য ও গোপনে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের শোষণ-শাসনের বিরোধিতা করে। ১৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দে দিনাজপুর রাজ-এস্টেটের রাজস্ব-ক্ষমতা হরণ করার জন্য কোম্পানি সরকার মি. ই ই লাউইজ নামে এক ইংরেজকে দিনাজপুরের প্রথম কালেক্টরেট হিসেবে নিযুক্ত করেন। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ রাজ-এস্টেটের আপোসহীন মনোভাব ও প্রশাসনিক কিছু অসুবিধার কারণে ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে দিনাজপুরের কালেক্টর পদ তুলে দিয়ে স্থানীয় কর্মচারীর সহযোগিতায় একটি 'আমীল' পদ সৃষ্টি করা হয় এবং ইতিহাস কুখ্যাত দেবী সিংহ সেই পদে অধিষ্ঠিত হোন। দেবী সিংহ ব্রিটিশ বেনিয়া-চক্রের ভক্ত-দালাল হিসেবে আজও জনসাধারণের মাঝে ঘৃণ্য। কর আদায়ে তার নিষ্ঠুর অত্যাচারী ভূমিকা ও ব্রিটিশ প্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্য নারী সরবরাহ ইত্যাদি চারিত্রিক স্খলন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রাজাকার, আলশামসদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কথিত

আছে, দেবী সিংহকে উচ্ছেদের জন্য উত্তরবঙ্গে তথা দিনাজপুরে প্রথম প্রজাবিদ্রোহ শুরু হয়। এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন একজন নারী জমিদার। উল্লেখ্য ১৭৮৪ সালে ভগলপুরের কৃষক বিদ্রোহে ব্যাপক সংখ্যক আদিবাসী জনমণ্ডল সম্পৃক্ত ছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই প্রাণে বাঁচার জন্য দিনাজপুর অঞ্চলে চলে আসে। আমরা জানি, সিপাহীবিদ্রোহের আগে এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রথম যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে সেটি হচ্ছে মুজাহিদ আন্দোলন। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে সংগঠিত মুজাহিদ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন সৈয়দ আহম্মদ বেরলভী। তৎকালীন দিনাজপুরের যুবকদের মধ্যে এই আন্দোলন দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। চিরিরবন্দর এলাকায় মুজাহিদ-বিপ্লবের অংশ হিসেবে ‘রাজস্ব প্রদান বিরোধী আন্দোলন’ সমগ্র উত্তরবঙ্গের মধ্যে ব্যাপক রূপ ধারণ করেছিল। সেই সময় রাজস্ব প্রদান বিরোধী আন্দোলনের দুঃসাহসিক নেতা ছিলেন তকী মোহাম্মদ সরকার ও মওলানা শাহ মোহাম্মদ। ১৮৩০ সালের কোল বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ প্রশাসনের অত্যাচারের কারণে অনেক কোল জাতিসত্তার মানুষ। যাদেরকেও আমরা পরবর্তীতে এই ভূখণ্ডের নানা আন্দোলন সংগ্রামে সংশ্লিষ্ট হতে দেখি। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ‘ওহাবী আন্দোলন’ গড়ে ওঠে। ওহাবী আন্দোলন মূলত মুজাহিদ আন্দোলনের পরবর্তী ধারা। সমগ্র দিনাজপুরের মধ্যে ওহাবীদের প্রধান আস্তানা ছিল দিনাজপুর শহর। তাছাড়া এই জেলার খোলাহাটি, নয়াবাদ, পাকেরহাট, চিরিরবন্দর, শিবপুর, বালুরঘাট, পোরশা, সনগাঁও প্রভৃতি অঞ্চলে ওহাবীদের আস্তানা গড়ে উঠেছিল। দিনাজপুরে ওহাবী আন্দোলনের কেন্দ্রগুলির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মওলানা করম আলী শাহ। তার নেতৃত্বে তৎকালীন ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন প্রখরতা লাভ করে।

১৮৫৫-৫৬ সালে ভগলদিঘী, দুমকা, ঝাড়খন্ড প্রদেশে সাঁওতাল বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে ইংরেজ প্রশাসন আদিবাসীদের উপর প্রতিশোধ ও নির্যাতন শুরু করলে অনেক আদিবাসী পরিবার দিনাজপুর অঞ্চলে পালিয়ে আসে। তাদের উত্তর-প্রজন্মরাই এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন এবং নানা সময়ে বাঙালিদের সঙ্গে থেকে কৃষিভিত্তিক আন্দোলন সংগ্রামে নিজেদের সংশ্লিষ্ট রাখেন।

১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে দিনাজপুরে প্রথম প্রজাবিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশে সমস্ত উত্তরবঙ্গে ক্রমশ প্রজাবিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী দশ বছরে মজনু শাহ, দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক, পন্ডিত শাহ প্রমুখ প্রজাবিদ্রোহের ক্ষীণশিখাটিকে অগ্নিমশালে তেজদীপ্ত করেন। কথিত আছে যে, মজনু শাহের দলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক ছিল। দিনাজপুরের ফকিরপাড়া, চিরিরবন্দর এবং বোদার অধীন বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে মজনু শাহের দলের গোপনীয় আড্ডা ছিল। এই বিদ্রোহীরা ইংরেজ কোম্পানিকে রাজস্ব প্রদানে নিষেধাজ্ঞা জারী করে গ্রামে গ্রামে প্রজাদের মধ্যে বিপ্লবের বাণী ছড়িয়ে দিতো। তদানীন্তন ব্রিটিশ কর্মচারীরা তাদেরকেও ‘ডাকাত’

বলে আখ্যায়িত করতো। উল্লেখ্য যে, কর আদায়ে বাধা দেওয়াই তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিলেন দেশপ্রেমিক শক্তি। ইংরেজদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তারা স্থানে-স্থানে গোপনভাবে সামরিক আয়োজন গড়ে তুলেছিলেন। তাদের রসদ যোগানোর জন্য দিনাজপুরের জনসাধারণ ডিং খরচা নামে একপ্রকার কর প্রদান করে তাদের সহায়তা করতো। দিনাজপুরের রাণীমাতা সরস্বতী প্রকাশ্যে এই ফকির ও সন্ন্যাসী-বিদ্রোহীদের সমর্থন দান করেন।

১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গঠিত হলে ১৮৯০ সালে দিনাজপুরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির শাখা গঠিত হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন শ্রী মাধব চট্টপাধ্যায়, শ্রী পরমেশ্বর দাঁ, শ্রী রাখাল সেন। তারাও রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। উল্লেখ্য ১৮৯৯-১৯০০ সালে মুন্ডা বিদ্রোহের রেশ দিনাজপুর অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে 'বঙ্গভঙ্গ' আইন পাশ হলে দিনাজপুরের ইতিহাসে এক চরম উত্তেজনা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। রাখী-বন্ধনের নামে এক বিশাল জনসেবায় তৎকালীন দিনাজপুরের হাজার হাজার হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিষ্টান, উক্ত সভায় যোগ দিয়ে এক মহামিলনের জনসমুদ্রে অবগাহন করেন। অবশ্য ঐদিন দিনাজপুরে হরতাল পালিত হয়েছে। 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের পর- ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীজুড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি সূচিত হলে দিনাজপুরেও ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। সেই সময়ের দিনাজপুরে বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রী রামবিনোদ ললিতা নেতৃত্ব প্রদান করেন। তারপরেই দিনাজপুরে ডায়মন্ড জুবিলী হলে এক রাজনৈতিক সভায় কৃষকনেতা জনাব ফজলুল হক বক্তৃতা করেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে দিনাজপুরের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আগমনে সর্ববৃহৎ শোভাযাত্রা এবং 'বন্দেমাতরম্' 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়', 'দেশবন্ধু কি জয়' ইত্যাদি শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হওয়া।

ঠিক সে সময়ে দিনাজপুরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'খেলাফত আন্দোলন' - মওলানা একিনউদ্দীন আহম্মদ, মওলানা ওয়াহেদ হোসেন, মওলানা কাদের বখস, মওলানা আব্দুল্লাহ-হেল-বাকী, মওলানা আবদুল্লাহ-হেল-কাফি, মওলানা আব্দুর রহমান সৈদী, মনির উদ্দীন আনওয়ারী প্রমুখের নেতৃত্বে বেগবান হয়। ১৯২০ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে মওলানা আব্দুল্লা-হেল-বাকীর নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলনের একটি শাখা- 'ওহাবী আন্দোলন' নামে জমিদারদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন ও চৌকিদারী ট্যাক্স ধার্যের বিরুদ্ধে সরাসরি কৃষকদের প্রভাবিত করে। এই সময় কৃষক-আন্দোলন জোরদার রূপ লাভ করলে দিনাজপুর জেলায় 'ছত্রিশ আন্দোলন' সংগঠিত হয়। ছত্রিশ আন্দোলন মূলত ছত্রিশ জাতি এবং ছত্রিশ গ্রামের সম্মিলিত সংগ্রাম। যেখানে জমিদার, সুদখোর মহাজন ও ব্রিটিশ আমলাদের অত্যাচার, অবিচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিবাদ গড়ে তোলা হয়। আদিবাসী

ও রাজবংশী এই দুই জাতি ছিল ছত্রিশ আন্দোলনের প্রাণশক্তি। এছাড়াও দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ, কাহারোল, বোচাগঞ্জ, খানসামা- এই চার থানায় ১৯২৪ থেকে ১৯২৫-এর মধ্যে গড়ে ওঠে প্রজাদের গাছকাটা আন্দোলন। যে আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জমিদারের অনুমতি ছাড়াই কৃষকদের বসতবাড়ির গাছকাটার স্বাধীনতা। এই আন্দোলনের পরেই ১৯২৭-১৯২৮ সালের মধ্যে দিনাজপুর জেলার কৃষকেরা দিনাজপুর রাজের বিরুদ্ধে কর বন্ধের আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের মূল নেতা ছিলেন মওলানা ফজলে হক। ১৯২৪-১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দিনাজপুরে গড়ে ওঠে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন। এই আন্দোলন জোরদার হয়েছিল বিরল থানায়। এর নেতৃত্বে ছিলেন সাঁওতাল সর্দার পাডু হাঁসদা। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় কৃষক প্রজাপার্টি গঠিত হলে দিনাজপুরেও এর শাখা গঠিত হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন মওলানা আবদুল্লাহ-হেল-বাকী এবং মওলানা ফজলে হক। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে লখনৌ শহরে অনুষ্ঠিত হয় সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলন। । যার ফলশ্রুতিতে ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলার 'কৃষক সমিতি'। ১৯৩৭-১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই দিনাজপুরের গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতি কার্যকর হয়ে উঠেছিল। কালী সরকার, সুশীল সেন, বসন্তলাল চ্যাটার্জি, অজিত রায়, জনার্দন ভট্টাচার্য্য, গুরুদাস তালুকদার, হাজী মোহাম্মদ দানেশ-সহ প্রমুখ নেতা এর নেতৃত্বে ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে দিনাজপুরের এই আন্দোলন কৃষক সমাজকে নতুন পথ দেখায়। এরফলে গড়ে ওঠে আধিয়ার আন্দোলন। ১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে সারাবিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। ফলাফলস্বরূপ- ১৯৪৩ সালে দেখা দেয় 'মন্বন্তর'। একদিকে দুর্ভিক্ষের করাল-ছায়ায়, অন্যদিকে জোতদার ও মহাজনদের শোষণ ও বঞ্চনায় পৃষ্ট হতে থাকে কৃষকেরা। তাই শেষ পর্যন্ত তেভাগার দাবীতে ১৯৪৬-১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে 'তেভাগা আন্দোলন'-এ সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে। দিনাজপুর জেলায় তেভাগা আন্দোলন জঙ্গীরূপ ধারণ করেছিল। তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন- দিনাজপুরের সুশীল সেন, অজিত রায়, গুরুদাস তালুকদার, হাজী মোহাম্মদ দানেশ-সহ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। এই তেভাগা আন্দোলনে আদিবাসীভুক্ত মানুষের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক। যে সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য একজন বীর ও শহিদ হচ্ছেন শিবরাম মাঝি। দিনাজপুরের ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায়, দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে এই জেলায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কৃষক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। যেমন: আঠারো শতকে- ফকির-সন্ন্যাসীবিদ্রোহ; উনিশ শতকে- ফরাজী-ওহাবী আন্দোলন, নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ; বিশ শতকে- রায়ত ও তেভাগা আন্দোলন। এছাড়াও দিনাজপুরে আরও বহু আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। যা এই জেলার ক্ষেত্রে ১৯৪৭-পূর্ব প্রতিরোধের সংগ্রামী ঐতিহ্যে চিরভাস্বর।

জেলার সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ইতিহাস: ১৯৪৭-১৯৭০

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে- ৩ জুন ১৯৪৭, ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসকে নিয়ে লন্ডন শহরে একটি গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করে। যেখানে দ্বিজাতিতত্ত্ব নীতির ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে পূর্ণ স্বাধীনতা দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরপরই ঐ মাসেই মওলানা হাসান আলীর সভাপতিত্বে রুহিয়ায় এক বিরাট অধিবেশন বসে। নেতৃবৃন্দ ঐ অধিবেশনে যোগদান করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হিসেবে দিনাজপুর জেলাকে পাকিস্তানভুক্ত করার দাবী করেন। মওলানা আব্দুল্লাহ-হেল-বাকী, মো. হাসান আলী, মওলানা নূরুল হুদা চৌধুরী, নূরুল হক চৌধুরী-সহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দিনাজপুরবাসীর দাবীর প্রস্তাব নিয়ে র‍্যাডক্লিফ কমিশনে প্রতিনিধিত্ব করেন। এরপর ১৯৪৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতবর্ষ দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পৃথক হয়। একটির নাম ভারত এবং অপরটির নাম পাকিস্তান। ভৌগলিকভাবে দিনাজপুর জেলাটি পূর্ব পাকিস্তানের শেষ উত্তরে অবস্থান পায়। নিত্যনতুন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সীমানা-বিরোধ, মুসলিম লীগের নতুন নেতৃত্ব, কংগ্রেসের ক্রমক্ষয়- সবকিছু মিলিয়ে দিনাজপুরে তখন দারুণ উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে 'তমদ্দুন মজলিস' ভাষা আন্দোলনের সাংগঠনিক রূপদানের উদ্দেশ্যে ঢাকায় একটি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করলে দিনাজপুরেও সেই আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে। ভাঙাগড়ার সেই সময়ে ভাষা আন্দোলনে দিনাজপুর আলোড়িত হয়। তৎকালীন দিনাজপুরের ছাত্রনেতা মুস্তাফা নূরুল ইসলাম, এম আর আখতার মুকুল, এস.এ বারী এ.টি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-পর্যায়ে নেতৃত্ব দিতেন। স্থানীয়ভাবে দিনাজপুর জেলাশহরে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব এবং সহায়তা দিতেন নুরুল হুদা, কাদের বক্স, দলিল উদ্দিন আহমেদ, আসলে উদ্দিন আহম্মদ, মাহমুদ মোবারক হোসেন, আব্দুল হাফিজ, নাসিম চৌধুরী, ফরহাদ আহমদ, দবিরুল ইসলাম, আব্দুল হক, মইনুদ্দিন আহম্মদ-সহ প্রমুখ। ১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুরের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ধর্মঘট পালন করে এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে শহরে মিছিল বের করে। ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্রে তৎকালীন সরকারের ষড়যন্ত্র রোধ করার জন্য ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ধর্মঘটের ডাক দিলে ঐদিন অনেক ছাত্রনেতা গ্রেফতার হয়। গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১৩ মার্চ থেকে ১৫ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হয়। দেশের অন্যান্য জেলার মতো দিনাজপুরেও ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯৫০-এর সেপ্টেম্বরে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী গণপরিষদে ঘোষণা করেন যে, উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। এই ঘোষণায় সারাদেশের মানুষের সাথে দিনাজপুরের জনগণও প্রতিবাদমুখর হয়। ১৯৫০ সালে দিনাজপুরের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

হলো– মাসিক নওরোজ (প্রথম প্রকাশ ১৯৪১) সাহিত্যপত্রিকাকেন্দ্রিক এবং নাজিমউদ্দীন মুসলিম হল ও পাবলিক লাইব্রেরি (হেমায়েত আলী পাবলিক লাইব্রেরি)-কে কেন্দ্র করে- সাহিত্যিক ও সাহিত্যমোদীদের সমন্বয়ে 'নওরোজ সাহিত্য মজলিস' গঠন। এই পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে দিনাজপুরে একদল সৃষ্টিশীল লেখক যে চর্চা চালিয়ে আসছিলেন, সেই সময় বাংলাভাষা আন্দোলনের জোয়ারে আরও বহু নব্য সৃষ্টিশীল লেখকেরা নব উদ্দীপনায় নিখাদ বাংলাভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন হেমায়েত আলী। পত্রিকাটির উল্লেখযোগ্য লেখকেরা হলেন: কবি কাজী কাদের নেওয়াজ, মাহমুদ মোকারম হোসেন, খান বাহাদুর আমিনুল হক, লায়লা সামাদ, মেহরাব আলী, ফুলুমদ্দীন মণ্ডল, নূরুল আমিন, আ.কা.শ নূর মোহাম্মদ, তাজাম্মুল হোসেন চৌধুরী, শওকত আলী, তোসাদ্দক হোসেন, এস.এম.এ রাজ্জাক, আজিজা এন মোহাম্মদ, তাজমিলুর রহমানসহ প্রমুখ।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কৃষক আন্দোলন অব্যাহত থাকে। দিনাজপুরসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গে 'তেভাগা আন্দোলন' আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এই কৃষক আন্দোলন দমন করার জন্য মুসলিম লীগ সরকার কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক আন্দোলনের বহু সহযোগীকে নানাপ্রকার কৌশলে বন্দি করে। এই সময়ে কৃষকনেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশকে দিনাজপুর থেকে বন্দি করে রাজশাহী কারাগারে প্রেরণ করা হয়। ফলে কৃষকদের মাঝে তৎকালীন ক্ষমতাশীন মুসলিম লীগ সরকার বিরোধী মনোভাব ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করতে থাকে। এই আন্দোলনেও আমরা আদিবাসী জনমণ্ডলের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ লক্ষ করি। যেমন শিবরাম মাঝির পাশাপাশি হেলেকেতু শিং, খেলু হাঁসদার নাম উঠে আসে। ১৯৫১ সালে যখন রক্ষণশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিষবাষ্পে বাঙালি চেতনা পর্যুদস্ত হচ্ছে, তাহ্জীব ও তমুদ্দুন-এর ঘেরাটোপে বাঙালির সংস্কৃতি-চিন্তা পলায়নপর, ঠিক সেই সময়ে একটি প্রগতিশীল পত্রিকা 'পাক্ষিক জেহাদ' আত্মপ্রকাশ করে। এটির যৌথ সম্পাদক ছিলেন আমিনুল হক চৌধুরী ও তোফাজ্জল হোসেন (তোজা)। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে 'রাষ্টভাষা বাংলা চাই' ও '১৪৪ ধারা ভাঙবোই ভাঙবো' শ্লোগান দিয়ে স্বাধিকার আন্দোলনের বীজ রোপন করে। ঐদিন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনের হুকুমে পুলিশ নিরীহ ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালায়। এরফলে রফিক, সালাম, শফিউর, বরকত, জব্বার-সহ অনেকে শহিদ হোন। এখানে উল্লেখ্য যে, দিনাজপুরের ছাত্রনেতা এস.এ বারী এ.টি, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন। ১৯৪৯ সালের জুন মাসে ঢাকায় পাকিস্তান সরকারের অগণতান্ত্রিক মনোভাব, পক্ষপাতমূলক সরকারি নীতি ও মুসলিম লীগের ভ্রান্ত-নীতির প্রতিবাদে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হয়।

এরপরেই মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী দিনাজপুরে সাংগঠনিক সফরে এলে রহিম উদ্দিন উকিল সাহেবের নেতৃত্বে দিনাজপুরে প্রথম বিরোধী দলের আত্মপ্রকাশ হয়।

দিনাজপুরের নাট্যশালা ও নাট্যচর্চার ইতিহাস যেমন গৌরবময় তেমনি ঐশ্বর্যময়। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ফলে দিনাজপুর জেলা বিভক্ত হলে দিনাজপুরের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কিছুদিন নীরবতা থাকলেও যথারীতি নাট্যচর্চা ও মঞ্চায়ন শুরু হয়। ফলে পাদপ্রদীপের শিল্পী হিসেবে আমরা পাইঃ বদ্রী বাবু, আমিনুর রহমান বুলু, সারোয়ার হোসেন হিরু, আব্দুর রশিদ, আদল সরকার, সত্যেন চক্রবর্তী, জয়নাল আবেদীন, হাসান আলী, তহসিন আহমেদ, হিমাংশু বাবু, সুকুমার চক্রবর্তী, আব্দুস সামাদ, আব্দুল গফুর, সুভাষ দত্ত, আকবর আলী, কাজী বোরহান, শাহ্ রহমত হোসেন, খায়রুল আনম, উলফাতুর রহমান, কানু চক্রবর্তী, নির্ঝীন রায় চৌধুরী, নিত্য দাস, রাধাপদ অধিকারী, গৌরাঙ্গ বাড়ৈ, শামসুর আলম, জিল্লুর রহমান, শাহজাহান শাহ, মাজেদ রানা, শাহনেওয়াজ ঝন্টু, আলতাফ আলী চৌধুরী, মোহন কুমার দাস, রেনু সরকার, বীণাপাণি, শান্তা ইসলাম, মোহসীন আলী, কালি নন্দী, মুকুল সেন, প্রভাত দাশগুপ্ত, সুধীর বাবু, রাজেন তরফদার, সত্যেন মজুমদার, মিন্টু চৌধুরী, মোতাবসীন হোসেন, নিমু সেন, খোকা বাবু, কালি নন্দী (ছোট), সুলতান সরকার, তালেব আলী, অমিয় সেন, সতীশ গুপ্ত, বেনু সেনসহ বহু শিল্পী। পরবর্তীতে সংগীতশিল্পী হিসেবে যারা খ্যাতি লাভ করেছিলেন তারা হলেন- শাহ মাহতাব উদ্দিন, উষা চক্রবর্তী, মনু সরকার, অলিভা দত্ত, কে জি রব্বানী। হাসিনা রহমান ছিলেন সেময়ের একজন নৃত্যশিল্পী।

১৯৫৩ সালে দিনাজপুর ইন্সটিটিউটের মুক্তমঞ্চে '৫২ সালের পথিকৃৎ নেতা জনাব গাজীউল হক ও নিজামুল হকের উপস্থিতিতে এবং জাহানারা লাইজুর নেতৃত্বে বগুড়া থেকে আগত একটি সাংস্কৃতিক দল গণমুখী-নৃত্য, গীতিনাট্য 'আলেখ্য' পরিবেশন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানটি দিনাজপুরের সংস্কৃতিমনা মানুষদের মনে নবদিগন্ত উন্মোচন করে এবং বাঙালি চিন্তা-চেতনায় রক্ষণশীল বিরোধী শিল্পচর্চার আগ্রহ বৃদ্ধি করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ সরকারের শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং দেশে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক প্রজাপার্টি, নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী পার্টির সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করে। এ. কে ফজলুল হক প্রাদেশিক আইন পরিষদের নেতা নির্বাচিত হোন। সেই সময় দিনাজপুরের ফজলে হক ও রহিম উদ্দিন উকিল এমএলএ নির্বাচিত হোন। ১৯৫৪ সালে আলী মনসুর রচিত 'পোড়োবাড়ি' নাটকটি শাখাওয়াত হোসেন সেতুর পরিচালনায় প্রথম নারী-পুরুষ সমন্বয়ে সফলভাবে নাট্যসমিতির মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়। উল্লেখ্য যে, সেই সময় সংস্কৃতিচর্চা-বিমুখ রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের মেয়েদের নাট্যাভিনয়ে

অংশগ্রহণ প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু প্রখ্যাত লেখক খান বাহাদুর আমিনুল হক দুদু মিঞা-এর মেয়েরা উক্ত নাটকে অভিনয় করেছিলে বলে জানা যায়।

১৯৫৫ সালে জেলা আওয়ামী লীগ-এর দলীয় মুখপত্র 'সাপ্তাহিক আওয়াজ' আজিজুর রহমান এ্যাডভোকেটের সম্পাদনায় ও জেলা আওয়ামী লীগ-এর সভাপতি রহিম উদ্দিন-এর পৃষ্ঠপোষকতায় আত্মপ্রকাশ করে। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সূত্রে জাতীয়বাদের নবচেতনার উন্মেষ এবং পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্যের দাবী নিয়ে দিনাজপুরের জনসাধারণের কণ্ঠরূপে 'সাপ্তাহিক আওয়াজ' প্রকাশিত হয়। ১৯৫৭ সালে শ্যাম ব্যানার্জীর তত্ত্বাবধানে দিনাজপুর টকিজ-মঞ্চে 'শ্যামলী' নাটক-সহ একটি বিচিত্রানুষ্ঠানে দিনাজপুর শহরের বহু সম্ভ্রান্ত মুসলিম ঘরের মেয়েরা অংশগ্রহণ করে। এটি দিনাজপুরের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যা- পরবর্তীতে দিনাজপুরের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিশেষ প্রভাব ফেলে।

১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হলে দিনাজপুরের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়। তা সত্ত্বেও দিনাজপুরের রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিকর্মীরা বিভিন্নভাবে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তাদের কার্যকলাপ অক্ষুণ্ন রাখে। এরপর ১৯৬০ সালে দেশে আইয়ুব খানের 'মৌলিক গণতন্ত্র' শাসন-ব্যবস্থারীতির প্রহসনমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে দিনাজপুরের প্রগতিবাদী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রকাশ্যে কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা দুরূহ হয়ে পড়ে। তথাপি ১৯৬১ সালে তৎকালীন সরকারের অবাঞ্ছিত রবীন্দ্রনাথের 'জন্মশতবার্ষিকী' প্রচুর প্রস্তুতি, উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দিনাজপুর নাট্য সমিতি মঞ্চে উদযাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন খলিলুর রহমান চৌধুরী। অন্যান্য প্রধান কর্মীদের মধ্যে ছিলেন– মোজাফ্‌ফর হোসেন খান, জিল্লুর রহমান, মির্জা বাবুল, আশিষ কুমার রায়, বিমল কুমার দে, শাহজাহান শাহ-সহ প্রমুখ। এখানে উল্লেখ্য যে, তৎকালীন দিনাজপুরের এসএন কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রগতিবাদী রাজনীতি ও সংস্কৃতিচর্চার পাদপীঠে পরিণত হয়। এসএন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব উদ্যোগে আয়োজিত সাহিত্যানুষ্ঠান, নৃত্যানুষ্ঠান, সঙ্গীতানুষ্ঠান, নাট্যানুষ্ঠান ও বিচিত্রানুষ্ঠান সমগ্র-শহরের আকর্ষণ-বিন্দু ছিল। এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংগঠনগুলোর চেতনামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন- মুক্তবুদ্ধিচর্চায় সহায়ক ভূমিকা পালন করতো।

১৯৬৩ সালে দিনাজপুরের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল একদল সাহসী যুবক 'নবরূপী' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে। বিশ্বের প্রগতিশীলতার সাথে সাযুজ্য রেখে সংস্কৃতিচর্চার উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। ঐ বছরেই দিনাজপুর নাট্য সমিতির উদ্যোগে কাজী বোরহানের বিশেষ তৎপরতায় পূর্ব পাকিস্তানে সর্বপ্রথম নাট্য উৎসব ও অভিনয় প্রতিযোগিতা

চালু হয়; যা আজ পর্যন্ত চালু রয়েছে। ১৯৬৩ সালের আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে 'পাক্ষিক কাঞ্চন' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। এই রুচিশীল অলংকরণ-সমৃদ্ধ পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন সাংবাদিক ও বিপ্লবী ছাত্রনেতা আ.ন.ম গোলাম মোস্তফা। পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে দিনাজপুরের ছাত্র-ছাত্রী এবং জনতা-মিলিটারি ট্রেনিং, সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং, ফাস্ট এইড ট্রেনিং, আনসার-মুজাহিদ ট্রেনিং গ্রহণ করে। সেই সময় এসএন কলেজে প্রথমবারের মতো বিজ্ঞানমেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই বিজ্ঞানমেলায় বেতারযন্ত্র স্থাপন করে নাটক-সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। ১৯৬৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী-দলগুলোর সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান তার ৬ দফা কর্মসূচি পেশ করেন। যা পরবর্তীতে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ হিসেবে কাজ করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে দেখা দেয় গণজাগরণ। উক্ত ৬ দফা কর্মসূচি দিনাজপুরের জনমনে জাগরণ সৃষ্টি করে এবং বিক্ষুব্ধ আন্দোলনে জনগণকে সম্পৃক্ত করে। এই সময় দিনাজপুর জেলাশহর ও গ্রামাঞ্চলে নাট্যচর্চার একটির বেগবান প্রবাহ বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে স্কুল, কলেজ এমনকি মেলাতে অনুষ্ঠিত ক্রীড়ানুষ্ঠান-সহ নাট্যানুষ্ঠান ও বিচিত্রানুষ্ঠান- জনগণের মাঝে অবাধ মিলনক্ষেত্র তৈরি করেছিল। ১৯৬৭ সালে পুনরায় বেতারে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে– পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতিসেবী ও বুদ্ধিজীবীরা পাড়া-মহল্লায় রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুলজয়ন্তী, সুকান্তজয়ন্তীসহ নানাপ্রকার অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে থাকে। ফলে উর্দুবাদী সংস্কৃতিতে আবদ্ধ-অর্গল ভেঙে একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশ রচিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের উত্থাপিত ৬ দফা দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন ক্রমশ বেগবান হলে– ১১ মাস জেলে থাকার পর শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি বেকসুর খালাস পেয়েও পুনরায় গ্রেফতার হয়ে ঢাকা সেনানিবাসের একটি কক্ষে আবদ্ধ থাকেন। আইয়ুব খান তার আমলা এবং দালালদের দিয়ে সাজালেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। যার ফলে জনজীবনে বহু বিক্ষোভ পুঞ্জিভূত হতে থাকে। সেই পুঞ্জিভূত বিক্ষোভকে ১১ দফার ভিত্তিতে আন্দোলনে রূপ দেয় সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ। মনে রাখা আবশ্যক, দিনাজপুর জেলাটি ব্রিটিশ-আমল থেকেই বাম-রাজনীতির আদর্শপুষ্ট-সমর্থনশীল ক্রিয়াস্থান হিসেবে পরিচিত। তবে ডান-রাজনীতির চর্চাও ছিল। কিন্তু ১১ দফা আন্দোলনে দেখা যায়, দল ও মত নির্বিশেষে দিনাজপুরের সকলেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। ফলে সেই সময় বহু জনসভা, মিটিং, মিছিল, প্রচারণা এবং প্রায় প্রতিদিনের সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে দিনাজপুর শহরটি যেন সমগ্রভাবে একটি বিপ্লবী-শহর হয়ে ওঠে। সেই বছরেই আগস্ট মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ভাষা সংস্কারের যে হটকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার পরিপ্রেক্ষিতে

দিনাজপুরের ছাত্র ও জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ফলে শহরে স্কুল-কলেজে প্রতিবাদী সভা-সমাবেশ হতে থাকে।

তারপর ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাস থেকেই গণআন্দোলন-ভিত্তিক সংগ্রাম শুরু হয়। ৩ নভেম্বর পল্টন ময়দানের এক জনসভায় বক্তৃতা করেন মাওলানা ভাসানী। তিনি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে এক উত্তেজক ভাষণে জনগণকে স্বাধিকার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে বাঙালির মুক্তিসনদ ৬ দফা এবং ১১ দফার দাবীতে বাংলার ছাত্র-যুবক, কৃষক-শ্রমিক ও মেহনতি মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক দুর্বার গণআন্দোলনের জন্ম দেয় ১৯৭০ সালে। অসংখ্য শহিদের রক্তে রাঙা হলো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শহর-বন্দর ও নগর। দিনাজপুরের কৃতিসন্তান আবু আহমেদ আসাদুল্লাহ সরকার ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনে ঢাকার রাজপথে গুলিবিদ্ধ হোন। তার গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর দিনাজপুরে বিদ্যুৎ-বেগে ছড়িয়ে পড়ে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ– খণ্ডমিছিল ও গণমিছিলের মাধ্যমে সরকার-বিরোধী তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দিনাজপুরে তখন সরকার বিরোধী একটি মোর্চা গড়ে ওঠে। এর আগে ৯ ডিসেম্বর ১৯৬৮, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান দিনাজপুরে এসে এক জনসভায় ক্ষুব্ধ-উত্তেজিত ভাষায় ঘোষণা করেন: 'বিরোধীদলের বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ বন্ধ করতেই হবে। কেন না সরকার দেশকে বিভক্ত হতে দিতে পারে না।' এই থেকে বাঙালি-চৈতন্যে স্বাধিকার-অস্তিত্ব প্রবল হয়ে ওঠে। ফলাফলস্বরূপ– ১৩ ডিসেম্বর ১৯৬৯, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। এই সময় দিনাজপুরেও সর্বস্তরের জনগণ সর্বাত্মক হরতাল পালন করে। এরপর শুরু হয় গণআন্দোলনের প্রবল জোয়ার। এই সময় দিনাজপুরের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বসে থাকেনি। নবরূপী-সহ বহু প্রতিষ্ঠান ও শিল্পী, জনতার কাতারে অংশগ্রহণ করেছিল।

শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য পাকিস্তান সরকার ১৯৬৯ সালের ১০ মার্চ, রাওয়ালপিন্ডিতে রাজনৈতিক নেতাদের এক গোলটেবিল বৈঠক ডাকে। ঐ বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্বশাসনের দাবী উত্থাপন করেন। কিন্তু এই দাবী অগ্রাহ্য হলে শেখ মুজিব বৈঠক বর্জন করেন। এইভাবে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় আইয়ুব খানের ক্ষমতা রক্ষার শেষ প্রচেষ্টাও বিফল হয়। তাই শেষপর্যন্ত তিনি প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ক্ষমতা গ্রহণ করে পুনরায় সারাদেশে সামরিক শাসন জারী করেন। অতঃপর রাজনৈতিক দলগুলোর দাবীতে এক বেতার-ভাষণে তিনি ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন। এই সময়ে আওয়ামী লীগ-সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা পালন করতে থাকে। তাছাড়া ছাত্র ইউনিয়ন-সহ অন্যান্য বিপ্লবী ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলো

রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডার সাথে সাথে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই সময় বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সহযোগীতায় দিনাজপুরের শিল্পীসমাজ, দিনাজপুর ইনস্টিটিউট মাঠে প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের চেতনা জাগানিয়া গণসংগীত, আবৃত্তি, নাটক-সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিবেশন করে। এই অনুষ্ঠানগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল- পাকিস্তান-বিরোধী গণজাগরণ গড়ে তোলা। এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডগুলো ঠাকুরগাঁও-সহ পঞ্চগড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১৯৭০ সালের নির্বাচন ও তার প্রতিক্রিয়া

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ৫ অক্টোবর ১৯৭০ ঘোষণা করলেও আগস্ট মাসে পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি জেলায় বন্যা হওয়ার কারণে নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে যায়। ফলে ১৯৭০ সালের ৭ এবং ১৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের সর্বত্র জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ঘূর্ণিঝড়-বিধ্বস্ত এলাকায় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের ৩০টি আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি। আওয়ামী লীগের ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ কোনো আসন না পেয়েও জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হয়। অন্যদিকে পাকিস্তানের পিপলস পার্টি (পিপিপি) পশ্চিম পাকিস্তানে ৮৮টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। আওয়ামী লীগের এই অভূতপূর্ব বিজয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে জনগণের রায়কে বানচাল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের চতুর্থ নির্বাচনের সময় দিনাজপুর অঞ্চলে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা বাড়িয়ে দুইটি থেকে ছয়টি করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে দিনাজপুর থেকে নির্বাচিত এমএনএ'রা হলেন:

১.মোশারফ হোসেন চৌধুরী, দিনাজপুর-১ আসন
২.আজিজুর রহমান অ্যাডভোকেট, দিনাজপুর-২ আসন
৩.এ বি এম মোকছেদ আলী, দিনাজপুর-৩ আসন
৪.প্রফেসর মো. ইউসুফ আলী, দিনাজপুর-৪ আসন
৫.শাহ মাহতাব আহমেদ, দিনাজপুর-৫ আসন
৬.ডা. ওয়াকিল উদ্দিন মন্ডল, দিনাজপুর-৬ আসন

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে দিনাজপুর থেকে নির্বাচিত এমএলএ'রা হলেন:

১.কমরুদ্দিন আহমেদ, দিনাজপুর-১ আসন

২.সিরাজুল ইসলাম অ্যাডভোকেট, দিনাজপুর-২ আসন

৩.মো. ফজলুল করিম, দিনাজপুর-৩ আসন

৪.একরামুল হক, দিনাজপুর-৪ আসন

৫.মো. গোলাম রহমান, দিনাজপুর-৫ আসন

৬.শাহ মো. ইউসুফ, দিনাজপুর-৬ আসন

৭.এম আব্দুর রহিম, দিনাজপুর-৭ আসন

৮.মো. খতিবর রহমান, দিনাজপুর-৮ আসন

৯.মো. সরদার মোশাররফ হোসেন, দিনাজপুর- ৯ আসন

১০.কাজী আব্দুল মজিদ চৌধুরী, দিনাজপুর-১০ আসন

১৯৭১ সালের এই নির্বাচনের পর পাকিস্তান পিপলস পার্টির জুলফিকার আলী ভুট্টো ও জেনারেল ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার এক নীলনকশা তৈরি করেন। পরিকল্পনা মতো নির্বাচনের পরে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন এবং ১২-১৩ জানুয়ারি শেখ মুজিবুরের সাথে দুই দফা বৈঠকে মিলিত হোন। ইয়াহিয়া খান ঢাকা থেকে করাচি বিমান বন্দরে পৌঁছে সাংবাদিকদের জানান যে, শেখ মুজিবুর রহমান দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী। অবশেষে ইয়াহিয়া খান ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ ঘোষণা করেন যে, ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭১-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেন যে, ৬ দফা দাবীর রদবদল না হলে তিনি অধিবেশনে বসবেন না। জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের অন্যান্য নেতাদের অধিবেশনে বসা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দেন। মূলত ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলীর কুট-পরামর্শে ১৯৭১ সালে ১ মার্চ আকস্মিকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।

এই আকস্মিক ঘোষণার ফলে ঢাকা-সহ সারাদেশে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ফলে দিনাজপুর আসনগুলোতে নির্বাচিত এমএনএ ও এমএলএ'রা এই সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে পাকিস্তান সরকার আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দণ্ডাদেশ জারী করে। এতে করে পাকিস্তান সরকারের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানিরা তথা দিনাজপুরবাসী শেষ অগ্নিরোষে জ্বলে ওঠে এবং শহরে লাগাতার মশাল মিছিল, নৌকা মিছিল, হরতাল-সহ নানাভাবে সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কার্যক্রম ঘোষণা দেয়। ঐদিকে শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কর্মসূচির মধ্যে ছিল– ২ মার্চ ঢাকায়, ৩ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল এবং ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জনসভা। তার ডাকে দিনাজপুরে স্বেচ্ছাসেবীবাহিনী গঠিত

হয় এবং ঢাকার কর্মসূচির সাথে মিল রেখে দিনাজপুরেও হরতাল-সহ আন্দোলন সফলকারী সকল কর্মসূচি সফলভাবে পালিত হয়। এই সময় ব্যবসা-বাণিজ্য, স্কুল-কলেজ, কোর্ট-কাচারি, ব্যাংক, বীমা-সহ সকল স্তরের স্বাভাবিক কাজকর্মে স্থবিরতা নেমে আসে। দিনাজপুরের জনগণ ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক সবধরনের ক্ষতি স্বীকার করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিটি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এখানে উল্লেখ্য যে, শত প্রতিকূলতায় ও ক্ষয়ক্ষতির মধ্যেও প্রতিটি মানুষের নৈতিক বল অক্ষুণ্ন ছিল। প্রকৃতপক্ষে সরকারি প্রশাসন-কাঠামো দিনাজপুরেও ভেঙে পড়ে এবং দিনাজপুরের স্থানীয় নেতাদের আদেশ-নির্দেশ সবকিছু পরিচালিত হতে থাকে। যাকে আমরা অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

অসহযোগ আন্দোলন ১৯৭১

১৯৭১ সালের ১ মার্চ আকস্মিকভাবে গণপরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেয় তৎকালীন পাকিস্তানের স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খান। এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ-সহ পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ বুঝে নেয় যে– ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে না এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে দেয়া হবে না। এই পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমান ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে এক বিরাট জনসভায় ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন ভোর ৫টা থেকে বেলা ২টা একটানা হরতাল ঘোষণা করেন। এই সময় কোর্ট-কাচারি, সরকারি অফিস, কলকারখানা, এমনকি রেল, স্টিমার-সহ সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ রাখার আহ্বান জানানো হয়। সভায় সামরিকবাহিনী প্রত্যাহার ও জনগণের দাবী না মানা পর্যন্ত খাজনা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পল্টনের ঐতিহাসিক জনসভাতেও 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্র প্রচার করা হয়। অবস্থার ভয়াবহতা উপলব্ধি করে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ ঘোষণা করেন যে, ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের সভা বসবে। এই সময় লে. জে. টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন-প্রশাসক ও গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। ফলশ্রুতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। যা মহাত্মা গান্ধীর সমস্ত রেকর্ড ভেঙে চরম আকার ধারণ করে।

২ মার্চ ১৯৭১ ঢাকায় শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালিত হয় এবং ৩ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র হরতাল পালিত হলে– দিনাজপুরেও অনুরূপ হরতাল পালন কর্মসূচি সফলতা লাভ করে। ৪ মার্চ গোলমালের অজুহাতে তৎকালীন সামরিক প্রশাসন রংপুর, সিলেট, খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে কারফিউ জারি করে। যদিও দিনাজপুরে কারফিউ জারি হয়নি, তবুও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দিনাজপুরের অফিস-আদালত বন্ধ ছিল। ৫ মার্চ শেখ মুজিবুরের আহ্বানে সারাদেশে ৫ দিনব্যাপী

হরতাল চলাকালে টঙ্গী, খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে গুলিবর্ষণ, রংপুরে কারফিউ জারি করলেও তা উপেক্ষা করে ঢাকাসহ সারাদেশে অসংখ্য সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। দিনাজপুরেও ঐদিন জেলা আওয়ামী লীগের ডাকে সভা ও শোভাযাত্রা করা হয়।

৬ মার্চ ১৯৭১, ইয়াহিয়া খান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন-প্রশাসকের পদ থেকে নবাবজাদা ইয়াকুবকে অপসারণ করে কুখ্যাত জেনারেল টিক্কা খানকে গভর্নর ও সামরিক আইন-প্রশাসক নিযুক্ত করে বাঙালিদের সায়েস্তা করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হাই কোর্টের বিচারপতিদের অসহযোগিতার ফলে টিক্কা খান শপথ নিতে পারলেন না। সেই সময় দিনাজপুরে জেলা আওয়ামী লীগ এবং নবগঠিত স্বেচ্ছাসেবী দলগুলো অসহযোগ আন্দোলনকে চালিয়ে নেওয়ার জন্য বিশেষ সভা আহবান করে।

৭ মার্চ ১৯৭১, ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিলেন- 'এরপর যদি আর একটা গুলি চলে- এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল- প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু- আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দিবে। [...] গুলি করবার চেষ্টা কর না, সাতকোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না। [...] এবং আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব, এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।' (তথ্যসূত্র ১: এম আর আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি, সাগর পাবলিসার্স, ঢাকা, ১৩৯১, পৃ. ৩৫৩)

অনেক চেষ্টার পর ৮ মার্চ ঢাকা রেডিও থেকে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণটি প্রচারিত হলে সারাদেশের মতো দিনাজপুরের মানুষও স্বাধীনতার জন্য বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই সময়ে দিনাজপুরের বিহারি-অবাঙালিদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। উল্লেখ্য যে, দিনাজপুরের নিউটাউনের ৮০% মানুষই ছিল বিহারি-অবাঙালি। তাদের গতিবিধি সন্দেহজনক ও জঙ্গি-মনোভাবাপন্ন হতে দেখা যায়। তারা গোপনে পাঠান-পাঞ্জাবিদের মধ্যমণি, দিনাজপুরে নিয়োগপ্রাপ্ত লে. জে. কর্ণেল তারেক রসুল কোরেশীর সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ঐদিন ৮ মার্চ গঠিত হয় দিনাজপুর জেলা সংগ্রাম কমিটি। এই কমিটির উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন: অধ্যাপক ইউসুফ আলী, শাহ মাহতাব, শাহ মো. ইউসুফ, আব্দুর রহিম, আমানুল্লাহ সরকার, হাজী মোহাম্মদ দানেশ, ডা. নইমুদ্দীন, হবিবর রহমান, জিল্লুর রহমান, মিজানুর রহমান, আব্দুস সামাদ, আহম্মদ হোসেন, মোকসেদ আলী, গুরুদাস তালুকদার,

গোলাম রহমান, ওয়াকিল উদ্দিন মন্ডল, খতিবুর রহমান, মজিদ চৌধুরী, এ টি এম মকবুল হোসেন, তেজেন নাগ, রফিক চৌধুরী, আজিজুল ইসলাম, সৈয়দ রিয়াজুল ইসলাম, মোশারফ হোসেন, আব্দুল লতিফ, মির্জা আনোয়ারুল ইসলাম তানু, এস.এ বারী এ.টি-সহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ।

৯ মার্চ ১৯৭১, দিনাজপুরে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকে এবং ঐদিন জনাব আবু তোরাব আমানুল্লাহ সাহেবের বালুবাড়িস্থ বাড়িতে একটি গোপন বৈঠক বসে। এই সভায় বয়স্কদের মধ্যে ডা. হাফিজ উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। সেদিন ঠিক করা হয় নিজ নিজ মহল্লায় স্বউদ্যোগে পাহারা দিতে হবে। এই সভায়- অবাঙালি অশুভ শক্তির সাথে দাঙায় লিপ্ত না হয়ে শান্তি রক্ষা করে চলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যাতে পশ্চিমাশক্তি ও প্রশাসন কারফিউ জারি করতে না পারে। তবে আক্রমণাত্মক কিছু ঘটলে অবশ্যই আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেদিন রাতে লাঠি-সোটা, তীর-ধনুক, বল্লম, তরবারি-সহ বিভিন্ন ধরনের দেশীয় অস্ত্র তৈরির ধুম পড়ে যায়। উল্লেখ্য যে, ঢাকার পল্টন ময়দানের এক বিরাট জনসভায় মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী অসহযোগ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তার বক্তব্য রাখেন।

১০ মার্চ ১৯৭১, ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন-সহ অন্যান্য স্বাধীনতাকামী নেতা-কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত হয়– 'ছাত্র বিগ্রেড' এবং 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। এই দুটি কমিটি পরস্পরের সাথে কাজ করে যায়। কমিটি দুটির নেতৃবৃন্দ হচ্ছেন: ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুর রহিম ও সাধারণ সম্পাদক মোকসেদুর রহমান, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মোতালেবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মো. সাইফুল ইসলাম, জাফর আলী, শরিফুল ইসলাম, মাহমুদুল হাসান মানিক, তৌহিদুল ইসলাম, মো. জাকারিয়া, মোকসেদ নূর-সহ আরও অনেকে।

মার্চের ১০ তারিখে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ-সহযোগিতা প্রদান করে সাফল্যজনকভাবে অব্যাহত রাখার জন্য জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করেন। ঐদিনই দিনাজপুরের ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা একাডেমি স্কুল-প্রাঙ্গণে এবং ছাত্র ইউনিয়ন আর্য পুস্তাকাগারের মাঠে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে। এর পাশাপাশি বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা গণেশতলাস্থ কার্যালয়কে কেন্দ্র করে গেরিলা যুদ্ধের কায়দা-কানুন, আক্রমণভাগ রচনা, সম্মুখ-যুদ্ধ, 'ককটেল মলোটভ' বোমা তৈরির কৌশল, যুদ্ধবিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা, গোপন প্রশিক্ষণ, চে গুয়েভারার অভিজ্ঞতা, ইত্যাদি বিষয়ে জেলাশহর এবং গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত জনতার মাঝে গণযুদ্ধের প্রস্তুতি-প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করেন। এই কার্যক্রমের নেতৃত্বে ছিলেন: আব্দুস সামাদ, মিজানুর রহমান, মঞ্জুর হোসেন, সৈয়দ মাহবুব হোসেনসহ প্রমুখ।

১১ মার্চ ১৯৭১, জেলার অবসরপ্রাপ্ত আনসার, পুলিশ, ইপিআর ও সেনাসদস্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসে। সেইসাথে অসহযোগ কর্মসূচি অব্যাহত রাখে। বিশেষ করে স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত বন্ধের কর্মসূচি জোরদারভাবে পালিত হতে থাকে।

১২ মার্চ ১৯৭১, দিনাজপুর সদর, বিরল, চিরিরবন্দর-সহ প্রায় প্রতিটি থানায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণপ্রতিরোধ বাহিনী গড়ে ওঠে। বিরল থানার এস এস ইউসুফ, কাসেম উদ্দিন, আনোয়ার খলিফা, ইদ্রিস আলী, মো. শফিক, চিরিরবন্দরের মাহতাব বেগ-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এই প্রতিরোধ বাহিনীর নেতৃত্ব দেন।

১৩ মার্চ ১৯৭১, দিনাজপুর সদর-সহ অন্যান্য থানায় অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকে।

১৪ মার্চ ১৯৭১, করাচির নিস্তার পার্কে আয়োজিত এক জনসভায় পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়াম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন: শেখ মুজিবুর রহমানের দাবী মোতাবেক পার্লামেন্টের বাহিরে সংবিধান-সংক্রান্ত সমঝোতা ছাড়া ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে পৃথকভাবে দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। (তথ্যসূত্র ২: এম আর আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি, সাগর পাবলিসার্স, ঢাকা, ১৩৯১, পৃ. ৩৬০)

ভুট্টোর এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে সারাদেশের মতো দিনাজপুরেও বিক্ষোভ ও অন্দোলন ক্রমেই তুঙ্গে যেতে থাকে।

১৫ মার্চ ১৯৭১, শেখ মুজিব পুনরায় বিবৃতি দেন: ‘লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।’ তার এই বিবৃতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে দিনাজপুরবাসী স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অসহযোগ কর্মসূচিকে এগিয়ে নেওয়ার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে।

১৬ মার্চ ১৯৭১, ঢাকায় ইয়াহিয়া-মুজিব **১ম** দফা বৈঠক বিফল হয়। দিনাজপুরের নেতৃবৃন্দ রেডিও-র খবর মারফত জানতে পারে সামরিক কর্তৃপক্ষ ২ মার্চের ঘটনার তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। তাছাড়া আবু তোরাব আমানুল্লাহর ডায়েরি থেকে জানা যায়, ৯-১৬ মার্চ পর্যন্ত দিনাজপুরে রাত্রিবেলা মহল্লায় মহল্লায় পাহারা চলছে। মানুষ সংগ্রামের জন্য তৈরি হচ্ছে। কারফিউ জারি হলে কী করা যাবে তার জল্পনা-কল্পনা চলছে ঘরে ঘরে। ঢাকায় কারফিউ-এর অভিজ্ঞতা ছিল যাদের, তারা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে শুরু করে। দিনাজপুরের এমএনএ এবং এমএলএ-গণ প্রায় সবাই ঢাকা থেকে চলে আসেন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে।

১৭ মার্চ ১৯৭১, দিনাজপুর শহরে একটি অস্ত্রমিছিল রাস্তা প্রদক্ষিণ করলে তা অসহযোগ আন্দোলনরত মুক্তিকামী দিনাজপুরবাসীর মনে প্রবল শক্তি সঞ্চয় করে। উল্লেখ্য যে, ঐদিন ঢাকায় মুজিব-ইয়াহিয়া ২য় দফা বৈঠক বিফল হয়। **১৮-১৯ মার্চ**

দিনাজপুরে অসহযোগ কর্মসূচী অপরিবর্তিত থাকে। তবে দিনাজপুরের অবাঙালি ধনী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে জোহা, ফরিদী, ইরাকী, সামাদ, এ্যাডভোকেট শামীম, বাচ্চা খান প্রমুখ দিনাজপুর ইপিআর হেডকোয়ার্টারের প্রধান লে. কর্ণেল কোরেশীকে কেন্দ্র করে বাঙালিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

২০ মার্চ ১৯৭১, পাকবাহিনীর দুই কোম্পানির 'ফাস্ট ফিল্ড রেজিমেন্ট' দিনাজপুর সার্কিট হাউজে অবস্থান নেয় এবং সার্কিট হাউজের সামনে ছাউনি ফেলে। ঐদিনই দিনাজপুরে কয়েকটি জঙ্গিমিছিল বের হয়। তাছাড়া বালুবাড়ি বলাই-এর মোড় থেকে একটি জঙ্গিমিছিল বের হয়। অনেক মহিলা ঐ মিছিলে অংশগ্রহণ করে। মিছিলে অনেকের হাতে লাঠি, বল্লম, সড়কি, তরবারি এবং পিঠে তীর-ধনুক ছিল। সেদিন জয় বাংলা শ্লোগানে মুখরিত ছিল দিনাজপুর।

২১ মার্চ ১৯৭১, দিনাজপুরের বালুবাড়ির অবাঙালি ব্যবসায়ী ঈশা মিঞা তার নিজের ডিজেল বাসের চাকাতে আগুন লাগিয়ে থানাতে এজাহার দেয় যে, বাঙালিরা তার গাড়িতে আগুন দিয়েছে। এই সাজানো ঘটনাকে কেন্দ্র করে কর্ণেল কোরেশী ও মেজর তারেক তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার ফয়েজ আহমেদকে কারফিউ জারির জন্য চাপ সৃষ্টি করে। এই সাজানো ঘটনার প্রতিবাদে দিনাজপুরবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

২২ মার্চ ১৯৭১, জুলফিকার আলী ভুট্টো, ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবুরের ত্রিপক্ষীয় আলোচনা বিফল হলে শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় এক জনসভায় বলেন, 'কোন জাতির পক্ষে আত্মদান ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছাড়া সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব না। একটা ঐক্যবদ্ধ জাতিকে বেওনেট ও বুলেট দিয়ে দাবিয়ে রাখা যায় না।' ঐদিনই একটি বিদেশি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের তিনিই হচ্ছেন প্রতিনিধি; তাই একমাত্র তারই শাসন করার অধিকার রয়েছে।' (তথ্যসূত্র ৩: তদেব, পৃ.৩৬৪) শেখ মুজিবুরের এই ঘোষণার পর দিনাজপুরের মানুষ আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে ওঠে এবং ২২ মার্চ "দিনাজপুরে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার একটি কুশপুত্তলিকা-সহ এক উন্মত্ত-মিছিল বের করে। কুশপুত্তলিকাটির বুকে তীর বসানো ছিল।' (তথ্যসূত্র ৪: হাসান হাফিজুর রহমান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, সপ্তম খণ্ড, তথ্যমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪, পৃ: ৪২৭)।

২৩ মার্চ ১৯৭১, রাণীরবন্দরের মাহতাব বেগের নেতৃত্বে মুক্তিপাগল দিনাজপুরবাসী সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টের মদদপুষ্ট অবাঙালিদের আগমনের প্রতিরোধে দিনাজপুর-সৈয়দপুর সীমান্তে আলোকডিহি গ্রামে অবস্থান নেয়। এক পর্যায়ে মাহতাব বেগ একটি বন্দুক নিয়ে অত্যন্ত সাহসের সাথে সিভিল ড্রেসের পাকসেনা বাহিনী ও অবাঙালিদের সাথে মোকাবেলা করতে থাকেন। তার সঙ্গে ছিল তার পুত্র, ভাই ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। এই সম্মুখ-যুদ্ধের একপর্যায়ে

শত্রুপক্ষের গুলিতে তিনি কাহিল হয়ে পড়েন। এই সময় আক্রমণ আরও তীব্রতা পেলে তার পুত্র রশিদ বেগ ও অন্যান্য সদস্যরা তাকে ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হোন। পরবর্তীতে ফিরে এলে মাহতাব বেগকে তারা আর সেখানে পায়নি। জানা যায়, শত্রুপক্ষ মাহতাব বেগকে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

পাকিস্তানিবাহিনির মদদপুষ্ট অবাঙালিদের বিরুদ্ধে এই হত্যাযজ্ঞের প্রতিশোধ নিতে ২৪ মার্চ দিনাজপুরের ভুষিরবন্দরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ সমবেত হয়ে সৈয়দপুর ক্যান্টমেন্টের উদ্দেশ্যে অভিযানের প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু নেতৃবৃন্দ তাদের এই বলে নিবৃত্ত করেন যে, 'কেবল মনোবল সম্বল করে যুদ্ধ জয় করা যায় না।' পরবর্তীতে প্রস্তুতি নিয়ে আক্রমণ করার জন্য সকলকে প্রস্তুত হতে বলেন।

২৫ মার্চ ১৯৭১, সমগ্র দিনাজপুর জুড়ে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টের সৈন্যদের আক্রমণ-ভীতি কাজ করে। শহরে উড়ো খবর আসতে থাকে যে, সিভিল পোশাকে পাকিস্তানি সেনারা রাইফেল চালাচ্ছে এবং ভারী অস্ত্র-সহ এগিয়ে আসছে দিনাজপুর শহরের দিকে। সেদিন দিনাজপুর শহর-সহ অন্যান্য থানায় সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত জনসাধারণ মহল্লায় মহল্লায় পাহারা বেষ্টনি রচনা করে সতর্কতার সাথে সারারাত জেগে কাটনোর আয়োজন করে। কিন্তু আনুমানিক রাত্রি ১টার দিকে বিদ্যুৎ চলে যায়। টহলরত জনগণ হঠাৎ অন্ধকারে ভয় পেয়ে যে-যেদিকে পারে ছুটে পালায়। কিছুক্ষণ পরেই শোনা যায়, পাকিস্তানিসেনাদের সাঁজোয়া গাড়ির শব্দ ও মেশিনগানের গুলির শব্দ। ভয়ে, আতঙ্কে, উৎকণ্ঠায় রাত ভোর হয়। প্রায় সারারাত দিনাজপুরের বিভিন্ন রাস্তায় এলোপাতাড়ি গুলির শব্দ শোনা যায়। পরেরদিন সকালে দেখা যায়, জনমানবহীন রাস্তায় শুধু পাকিস্তানিসেনাদের সাঁজোয়া গাড়ির বহর। বাড়িতে বাড়িতে টেলিফোন লাইন কাটা।

২৬ মার্চ ১৯৭১, ভারতীয় বেতারে ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে ঢাকায় পাকিস্তানিবাহিনীর নৃশংস গণহত্যার খবর প্রচারিত হলে সমগ্র দিনাজপুরের মুক্তিকামী মানুষ বিভিন্ন গোপন স্থানে সমবেত হয়ে পরবর্তীতে করণীয়-বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে পাকিস্তানিসেনাদের একটি বিশাল কনভয় দিনাজপুর শহরে প্রবেশ করে আস্তানা গাড়ে। শত্রুর পাশাপাশি মুক্তিকামী জনতা 'জয় বাংলা' শ্লোগানে সমগ্র দিনাজপুর প্রকম্পিত করে তোলে। আদিবাসী জাতিসত্তার মানুষজন তীর-ধনুক নিয়ে বাঙালিদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। সেইসাথে দিনাজপুরে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি।

জেলার মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ছাত্র ও পেশাজীবী সংগঠন

১৯৭১ বাঙালি জাতিসত্তা ও এদেশে বসবাসরত আদবাসী মানুষের অস্তিত্ব-চেতনা শক্ত জমিনে প্রতিষ্ঠার কাল। যে প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে মধুর, সবচেয়ে উজ্জ্বল নাম স্বাধীনতা। যার সবচেয়ে বাস্তব পরিচয় বাংলাদেশ। হাজার বছরের বাঙালির আকুল প্রার্থনার ফসল যেমন বাংলাদেশ, ঠিক তেমনি আদিবাসীগণ তাদের অস্তিস্ব বিকাশের স্বপ্ন দেখে এই বাংলাদেশকে ঘিরে। ১৯৪৭ পরবর্তী সময় থেকেই এই দেশের জনগণ তাদের আত্মপরিচয়ের স্বকীয় ঠিকানার জন্য লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে যায়। এর উল্লেখযোগ্য প্রমাণ আমরা পাই ১৯৪৬-৪৬ সালে সংগঠিত তেভাগা আন্দোলনে। যে সংগ্রামে বাঙালি ও আদিবাসী জাতিত্তার মানুষজন একাকার হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন হয়ে ওঠে বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের প্রথম বীজমন্ত্র। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন বাঙালিকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে। তাদের এই আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও তাদের দোসরেরা বিচলিত হয়ে ওঠে। এরপর ১৯৫৮ সালে জারি হয় সামরিক-শাসন। সামরিক-শাসনের জংলি আইনের গ্যাড়াকলে বাঙালি কিছুদিন ভীতসন্ত্রস্ত হলেও পরবর্তীতে তাদের অসার নীতিকথা, মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ ও শোষণ-শাসনে বাঙালিরা বুঝতে পারে আইয়ুব খানের মার্শাল ল'-এর অন্তসারহীনতা। দীর্ঘদিনের কারফিউ এবং জরুরি আইনে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা জীবন নড়ে চড়ে ওঠে। ১৯৬০ সালের প্রহসনমূলক মৌলিক গণতন্ত্র, ১৯৬২-এর শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলন ক্রমেই বিস্ফোরিত হয় ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে। এরপর ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজয় আবারও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে আরও বিপদগ্রস্থ করে তোলে। শুরু হয় ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত। কিন্তু বাঙালি ৬ ও ১১ দফার ভিত্তিতে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে। শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চ ভাষণের পর স্বাধিকার আন্দোলন সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশের সকল জেলার মতো দিনাজপুরেও এই সংগ্রাম সর্বাত্মক হয়ে মুক্তিযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যায়। জেলার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ছাত্র সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠন-সহ সর্বস্তরের জনগণ এই মরণপণ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসরদের হাতে নিষ্ঠুর নির্যাতন এবং বাঙালি-বিরোধী তৎপরতা ও হত্যার শিকার হয়েও তারা সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এক-নদী রক্তের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনে প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা। অন্যান্য জেলার মত এই আন্দোলনগুলোতে দিনাজপুরে মানুষজন জেগে ওঠে। এই জেগে ওঠা জনতার কাতারে জেলার বাঙালি ও আদিবাসীদের অংশগ্রহণ ছিল গৌরবদীপ্ত। কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতিকেন্দ্রিক ইতিহাস চর্চায় শুধু বাঙালিদের ভূমিকাই আমরা দেখতে পাই। কিন্তু ঐ সংগ্রামগুলোতে সংখ্যায় কম আদিবাসীদের ভূমিকা ইতিহাসে প্রায়

অনুল্লিখিত হয়ে আছে। আমরা মনে করি এই জায়গায় আবার নতুন করে আলো ফেলা প্রয়োজন। ১৯৪৭-৭১ পর্যন্ত সংগঠিত আন্দোলনসমূহে ব্যক্তি বাঙালিদের পাশাপাশি আদিবাসী জাতিসত্তার ব্যক্তিদের ভূমিকা কম নয়। সাংগঠনিক চারিত্রের দিকে যদি তাকাই, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মানুষগুলোর মধ্যে বাঙালি কেন্দ্রিক হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান যেমন সংশ্লিষ্ট ছিল তেমনি ছিলেন আদিবাসী জাতিসত্তার মানুষজন। কাজেই সংগঠিনক চিন্তা দিয়ে যখন আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধোকে বিবেচনায় আনতে চাই তখন অবশ্যই বাঙালি আদিবাসীকে কোন বিভেদের সীমারেখায় রেখে বিবেচনা করবো না। দিনাজপুর জেলার সকল সাংগঠনিক তৎপরাতে বাঙালিদের পাশাপাশি সংখ্যায় কম আদবাসী জাতিসত্তাও সংশ্লিষ্ট ছিল। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে জেলার যেসব রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-ছাত্র সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠন– যাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং অপূর্ব আত্মত্যাগ, সর্ববিপদজয়ী শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল তাদের ভূমিকা নিয়ে এই অধ্যায়টি সীমাবদ্ধ থাকবে। এরপরেও অধ্যায়টি পূর্ণাঙ্গ হবে না বলে আমাদের বিশ্বাস।

রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা নিচে তুলে ধরা হলো:

আওয়ামী লীগ: মুক্তিযুদ্ধের সূচনা থেকে শেষপর্যন্ত দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের ভূমিকা অত্যন্ত বলিষ্ঠ। আমরা জানি, বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রাম ছিল এক সর্বজনীন গণযুদ্ধ। এতে ছাত্র-শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, কৃষক, শ্রমিক, লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী-সহ সমাজের সকল স্তরের মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তবে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের পেছনে একটি রাজনৈতিক দর্শন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যার চালিকাশক্তি হিসেবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ফলে সেই সময়ের সকল পেশাজীবী ও সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগ কিংবা স্বাধীনতার স্বপক্ষের যেকোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে কাজ করেছে। এই কথা অবশ্যই উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দর্শনের সাথে দেশের আপামর জনসাধারণের তৎকালীন স্বাধীনতার প্রশ্নে এক অভিন্ন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধের সময় দিনাজপুর জেলার ক্ষেত্রে একই ঘটনা লক্ষণীয়। অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে ভারতের ক্যাম্প পরিচালনা, মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং, গেরিলাযুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ-সহ মিত্রবাহিনীর সহযোগিতায় সার্বিক যুদ্ধ-পরিচালনায় দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের এক গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। অসহযোগ পর্ব প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি যে, সেখানে দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, নির্বাচিত এমএনএ এবং এমএলএদের সফল সাংগঠনিক ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া ২৯ মার্চ থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত মুক্ত দিনাজপুর নিয়ন্ত্রণে জেলা আওয়ামী লীগের ভূমিকা প্রশংসনীয়। ৩১ মার্চ দিনাজপুর ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে পাকিস্তানিবাহিনীর প্রতিরোধ-কল্পে যে

সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানেও দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে। ঐ সভাতেই জেলা আওয়ামী লীগের নির্বাচিত এমএনএ অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে দায়িত্ব দিয়ে ভারতে প্রেরণ করা হয়। যাতে করে তিনি ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে কাজ করতে পারেন। পরবর্তীতে আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে দেখেছি। এমনকি ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে সেখানে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। মুক্তিযুদ্ধে তার এই ভূমিকা শেষপর্যন্ত দিনাজপুর আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা বলে গণ্য হয়। ঐ সময়ে দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আজিজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইসলাম জগলু, সহ-সভাপতি ডা. ওয়াকিল উদ্দিন মণ্ডল-সহ তৎকালীন এমএনএ ও এমএলএ যারা আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ছিলেন তারা সকলেই মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের নিজ নিজ সাংগঠনিক দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করে দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক ভিত্তিকে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে পরিচালিত করেন।

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী): ন্যাপ-ভাসানী'র দিনাজপুর জেলাশাখার তৎকালীন উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ ছিলেন– হাজী মোহাম্মদ দানেশ, বরদাভূষণ চক্রবর্তী, আমানুল্লাহ সরকার, এস.এ বারী এ.টি, আসলে উদ্দীন আহমেদ, আব্দুল কাইয়ুম, আব্দুস সামাদ, আমিনুল ইসলাম-সহ প্রমুখ। অসহযোগ আন্দোলনের সময় দিনাজপুরের ন্যাপ সেই আন্দোলনে পূর্ণমাত্রায় সমর্থন দিয়ে অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া দিনাজপুর ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সভাতে এই দলের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ১৩ এপ্রিলের পর দিনাজপুরের জনসাধারণ ভারতের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করলে এই দল মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ঐ সময়ে ভারতে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয়ে মুক্তিসংগ্রাম কমিটি গঠিত হলে সেখানে মাওলানা ভাসানীকে চেয়ারম্যান ঘোষণা করে মুজিবনগর সরকারের কাছে অস্ত্রের জন্য আবেদন জানান। উল্লেখ্য যে, দিনাজপুরের ন্যাপ নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশ সেই সংগ্রাম কমিটির উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করেন। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয়ে মুক্তিসংগ্রাম কমিটি গঠিত হলে দিনাজপুর ন্যাপ-ভাসানী'র সকল নেতা-কর্মী স্বাধীনতার স্বপক্ষে কেন্দ্রীয় কমান্ডের নির্দেশ অনুযায়ী ভারতের কালিয়াগঞ্জ, বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর-সহ বিভিন্ন স্থানের শরণার্থী শিবিরে ও দিনাজপুরের অভ্যন্তরে অবস্থিত অস্থায়ী ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোতে তাদের নৈতিক সমর্থন দিয়ে মোটিভেশন কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মুজাফ্ফর): ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে ন্যাপ– মুজাফ্ফর সেই সরকারকে সমর্থন করে। যুদ্ধের সময় বিভিন্ন শরণার্থী শিবির-সহ ট্রেনিং ক্যাম্পে তাদের নৈতিক সমর্থন দিয়ে পার্টির

কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। সেই সময়ে দিনাজপুরে ন্যাপ-মুজাফ্‌ফরের বলিষ্ঠ নেতা গুরুদাস তালুকদারসহ অন্যান্য সদস্যরা দিনাজপুরের অসহযোগ পর্বে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। উল্লেখ্য যে, ২৫ মার্চ রাতে গুরুদাস তালুকদার, তেজেন নাগ-সহ অনেক কর্মী পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের কালো আইনে গ্রেফতার হয়। ২৯ মার্চ দিনাজপুর জেলখানায় আক্রমণ চালিয়ে জনগণ তাদের বের করে নিয়ে আসে। দিনাজপুর জেলা ন্যাপ-মুজাফ্‌ফর কমিটির তৎকালীন সভাপতি ছিলেন- এফ এ মোজাফ্‌ফর হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তেজেন নাগ, দপ্তর সম্পাদক ছিলেন কাজী আ জা ম লুৎফর রহমান চৌধুরী। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ ছিলেন- এ টি মকবুল আহমেদ, মির্জা আনোয়ারুল ইসলাম তানু, আব্দুস সাত্তার ঋষি, যোহাক আলী, আব্দুস সাত্তার, আবুল কালাম আজাদ, মতিয়ার রহমান-সহ প্রমুখ। ন্যাপ-মুজাফ্‌ফরের দিনাজপুর জেলা কমিটির সকল নেতা-কর্মী মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (সকল গ্রুপ): পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি নানা দ্বিধা-বিভক্তিতে বিভক্ত ছিল। সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকায় এই দলের কর্মীরা ন্যাপের আশ্রয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। দিনাজপুরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরাও উক্ত কৌশলে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে তাদের অবস্থান অব্যাহত রাখে।

মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলাম: দিনাজপুরের অসহযোগ আন্দোলন পর্ব থেকে শুরু করে ২৯ মার্চ ১৯৭১ পরবর্তী ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত মুক্ত দিনাজপুরে উক্ত পার্টি দুটি কৌশলগত কারণে প্রকাশ্যে নিশ্চুপ থাকলেও ১৩ এপ্রিলের পর থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত পাকিস্তানি প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর দোসর-রূপে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।

সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা নিচে তুলে ধরা হলো:
আর্য পুস্তকাগার: এটি দিনাজপুরের প্রাচীনতম লাইব্রেরিগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই লাইব্রেরিটিকে কেন্দ্র করে সাহিত্য ও সংস্কৃতিমনা দিনাজপুরের অধিবাসী তাদের মুক্তচিন্তার প্রয়াসকে অক্ষুন্ন রাখে। সেই সময় সভাপতি ছিলেন অধ্যক্ষ মাহমুদ মোকাররম হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মির্জা আনোয়ারুল ইসলাম তানু। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন শ্রী প্রভাত দাশগুপ্ত, নরেশ চক্রবর্তী, পুলক দাশগুপ্ত, মতিয়ার রহমান সরকার, নূরুল ইসলাম, নাসিম চৌধুরী, গোপাল ভৌমিক-সহ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিষ্ঠানটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্য মুক্তিযুদ্ধের শক্তি হিসেবে তাদের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ভূমিকা অক্ষুণ্ন রাখে। উল্লেখ্য যে, ১৩ মার্চ পাকিস্তানিসেনারা সৈয়দপুর থেকে দিনাজপুর অভিমুখে অগ্রসর হলে

তাদের নিক্ষিপ্ত শেলিং-এ প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপক ক্ষতি হয়। মুক্তিযুদ্ধের অসহযোগ-পর্ব ও প্রতিরোধ-পর্বে এই প্রতিষ্ঠানটি আন্দোলনের ঘাঁটি হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

হেমায়েত আলী পাবলিক লাইব্রেরি (খাজা নাজিমুদ্দিন মুসলিম হল ও লাইব্রেরি): হেমায়েত আলী-এর নেতৃত্বে ১৯৩৬ সালে মুসলিম ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার সাংস্কৃতিক-কর্মীরা এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানটির (খাজা নাজিমুদ্দিন মুসলিম হল ও লাইব্রেরি) গোড়াপত্তন করেন। এই প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে 'নওরোজ সাহিত্য মজলিস' গড়ে ওঠে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের খ্যাতনামা সাহিত্যিকেরা এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'নওরোজ' পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে তাদের সাহিত্যচর্চা, প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার আড্ডা অব্যাহত রাখে। এই প্রতিষ্ঠানেরই আরও একটি ঐতিহ্যবাহী অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান হলো– 'দিনাজপুর মিউজিয়াম'। যার সম্পাদক ও কিউরেটর ছিলেন মেহরাব আলী। খাজা নাজিমুদ্দিন হল ও তার অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় দিনাজপুরের মুক্ত চিন্তা-চেতনার সাহিত্য-সংস্কৃতিকর্মীরা স্বাধীনতা অর্জনের সকল ধাপে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে কাজ করেছেন। উল্লেখ্য, দিনাজপুর মিউজিয়ামে প্রাচীন বাঙালি-সংস্কৃতির আদি নিদর্শনস্বরূপ ১৫০০ ছোট-বড় মূল্যবান 'এ্যান্টিকস' সংগৃহীত ছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সেনা ও তার দোসরেরা বাঙালি-সংস্কৃতির এই মূল্যবান নিদর্শনগুলো ধ্বংস ও লুণ্ঠন করে। তাছাড়া নাজিমুদ্দিন হলের মূল্যবান গ্রন্থ, নওরোজ পত্রিকার সমগ্র সংগ্রহ ও পত্রিকার প্রেস সেকশনটি লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। বর্তমানে লাইব্রেরিটির নাম পরিবর্তন করে 'হেমায়েত আলী পাবলিক লাইব্রেরি' করা হয়েছে।

দিনাজপুর নাট্য সমিতি: ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত দিনাজপুর নাট্য সমিতি ভারতবর্ষে বাঙালি-নাট্যচর্চার অন্যতম আদিপীঠ হিসেবে চিহ্নিত। উল্লেখ্য যে, কলকাতায় নাট্যচর্চার অব্যহতিকাল পরেই উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরে এই নাট্যপ্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। ঐতিহ্যবাহী এই নাট্য সমিতি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ক্রমেই তার অবস্থানকে আধুনিক করে তোলে। মঞ্চ-স্থাপনা, পোশাক, সাজ-সজ্জা, নাট্যমঞ্চায়নের প্রামাণ্য তথ্য ও দুঃপ্রাপ্য নাট্যগ্রন্থের বিশাল সংগ্রহ ছিল নাট্য সমিতির। তৎকালীন সংস্কৃতিকর্মী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে নাট্য সমিতির নিবিড় যোগসূত্র ছিল। ব্রিটিশ-ভারত আন্দোলন থেকে বাহান্ন-এর ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত এই নাট্যপ্রতিষ্ঠানটির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে জড়িত ছিলেন- ডা. হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, মকবুল হোসেন, গুরুদাস তালুকদার, বেণু সেন, শ্রী প্রভাত দাসগুপ্ত, রশিদ আহমেদ, তালেব আলী, আকবর আলী ঝুনু, মতিয়ার রহমান সরকার, একিন মোহাম্মদ সরকার, মির্জা

গোলাম রাব্বানী, পুলক দাশগুপ্ত, শামসুল আলম, নিত্য দাস, সাজ্জাদ হোসেন চৌধুরী, খায়রুল আনম, সৈয়দ রিয়াজুল হোসেন, কাজী বোরহান, মাজেদ রানা, মোহন কুমার দাস, আলতাফ আলী চৌধুরী, মির্জা আনোয়ারুল ইসলাম তানু, খাদেমুল ইসলাম, মোফাজ্জল হক, কান্ত দাস, আদল সরকার, ময়না নন্দী, জিল্লুর রহমান, শাহজাহান শাহ-সহ প্রমুখ। এরা সবাই সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে স্বাধীনতার স্বপক্ষ হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানিসেনা ও তার দোসরেরা প্রতিষ্ঠানটির পোশাক, সাজ-সজ্জা, নথিপত্র ও দুঃপ্রাপ্য নাট্যপুস্তক, দৃশ্যপটসমূহ ও নাট্যমঞ্চটির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।

নবরূপী: বাঙালি-সংস্কৃতির চেতনায় উদ্বুদ্ধ দিনাজপুরের প্রগতিশীল যুব-সমাজ **১৯৬৩** সালে 'নবরূপী' প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রতিষ্ঠানটি নাটক মঞ্চায়ন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনা, সংগীত শিক্ষা, প্রকাশনা-সহ বিভিন্ন বিষয়কে সামনে রেখে বাঙালি সংস্কৃতিচর্চায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এই প্রতিষ্ঠানের নাট্যদলটি নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাসে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক সাড়া ফেলে দেয়। স্বাধীনতার সূচনা-পর্বে এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন– মো. খায়রুল আনম ও শাহজাহান শাহ। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন– কাজী বোরহান, মকবুল হোসেন, আলতাফ আলী চৌধুরী, মোহন কুমার দাস, মাজেদ রানা, আবু তালেব মনু, শাহনেওয়াজ ঝন্টু, জিল্লুর রহমান, এনায়েত-এ-মওলা জিন্নাহসহ প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, **১৯৬৯**-এর গণঅভ্যুত্থানে গণজাগরণ-কল্পে এই প্রতিষ্ঠান দিনাজপুর সদর-সহ ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় পর্যন্ত বিভিন্ন উদ্দীপনামূলক নাটক, গণসংগীত ও আবৃত্তির ভাণ্ডার নিয়ে বহু অনুষ্ঠান পরিবেশনা করেছে। গণজাগরণের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি গণজাগরণমূলক বক্তব্য প্রদান করে জনমনে উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে। অসহযোগ আন্দোলনের শুরুর সময় থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা ভ্রাম্যমাণ সাংস্কৃতিক-স্পট তৈরি করে দিনাজপুর শহর থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত গণজাগরণমূলক অনুষ্ঠান পরিবেশনা করেছে। তাছাড়া অসহযোগ-পর্বে বিভিন্ন স্তরে এই প্রতিষ্ঠানটির কর্মকান্ড অব্যাহত ছিল। **১৩** মার্চের পর থেকে ভারতের বিভিন্ন শরণার্থী শিবির-সহ অন্যান্য অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে সাংস্কৃতিক প্রচারণা অব্যাহত রাখে।

এছাড়াও তৎকালীন থানা (উপজেলা) ও গ্রাম পর্যায়ে বেশকিছু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যে প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বাঙালি ও আদিবাসী জাতিসত্তার মানুষজন নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্বতীপুরের প্রগতি সংঘ, পার্বতীপুর রেলওয়ে সামাদ ইন্সটিটিউট, সুধী সংঘ দূর্গাপুর পাবর্তীপুর, সেতাবগঞ্জ সুগারমিল নাট্যদল, নিউ কিশোর অপেরা (বীরগঞ্জ), আপন দুলাল

যাত্রাদল (বীরগঞ্জ), তৎকালীন প্রধান শিক্ষক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে গড়ে ওঠা রাজারামপুর ইজিকেল হাই স্কুল সাংস্কৃতিক দল (ফুলবাড়ি), ঘোড়াঘাট পাবলিক লাইব্রেরি জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গৌরব মণ্ডিত করেছে।

দিনাজপুর জেলার ক্রীড়াঙ্গন ১৯৪৭-১৯৭১ বেশ সচল ছিল। দিনাজপুরের বড়মাঠ কেন্দ্রীক খেলাধুলা চর্চায় আমরা টাউন ক্লাব, এমিটি ক্লাব উল্লেখযোগ্য। থানাগুলোর মধ্যে পার্বতীপুর বিশেষ অগ্রগণ্য হয়ে উঠেছিল ফুটবলের জাদুকরখ্যাত সামাদের কারণে। ফুলবাড়ি, সেতাবগঞ্জ, ঘোড়াঘাট থানাগুলোতেও ফুটবল খেলা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য ফুটবলসহ বিভিন্ন এ্যাথলেটিক গেমসমূহে আদিবাসী খেলোয়াড়রাই সবচেয়ে বেশি প্রানবন্ত ছিলেন। উল্লেখ্য তৎকালীন সংস্কৃতি ও খেলাধুলায় চর্চায় বাঙালি ও আদিবাসীগণ সাংগাঠনিকভাবে সংস্কৃতি চর্চায় নিয়োজিত থেকে জেলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে গৌরবদীপ্ত করেছে। লক্ষণীয় আদিবাসীগণ সংস্কৃতজাত জনমণ্ডল, ফলে বাঙালিদেরকে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে সংস্কৃতি চর্চা করতে হয়েছে, অন্যদিকে আদিবাসীগণ পারিবারিক ও সামাজিকভাবেই প্রতিনিয়ত সংস্কৃতি চর্চা করে অত্র অঞ্চলে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে ঋদ্ধ করেছে।

ছাত্র ও পেশাজীবী সংগঠনগুলোর ভূমিকা নিচে তুলে ধরা হলো:

ছাত্রলীগ: দিনাজপুরের ছাত্রলীগ ১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলনের সময় অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে আওয়ামী লীগের প্রকাশিত ১১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকে। সেই সময় দিনাজপুরের ছাত্রলীগের কমিটিতে মাকসেদুর রহমান, আব্দুর রহিম, আমজাদ হোসেন, হামিদুর রহমান, রঞ্জু, কাইয়ুম মইনুল ইসলাম, আবুল হাসেম তালুকদার, মাহতাব সরকার, এমদাদ চৌধুরী, আব্দুল কাইয়ুম, মনোয়ারা বেগম, মোসলেম উদ্দিন আহমেদ, আব্দুল জব্বার, আব্দুল মালেক-সহ প্রমুখ ছাত্রনেতা উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করে। অসহযোগ-পর্ব থেকে ১৩ এপ্রিল ১৯৭১ অর্থাৎ দিনাজপুর শত্রুমুক্ত থাকা পর্যন্ত সময়টাতে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে গেরিলা ট্রেনিং-এর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে ওঠে দিনাজপুর ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে। দিনাজপুরের তৎকালীন ছাত্রলীগের সিদ্ধান্ত এবং সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক মাকসেদুর রহমানের সক্রিয় উদ্দ্যোগ ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা আমজাদ হোসেন, শফিউল আলম প্রধান, মো. আসাদুল্লাহ্‌ এবং জেলা ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতা মোজাফফর হোসেন খান (মজু) এবং মো. আবুল কাশেম অরু-এর পরামর্শে জেলা ছাত্রলীগ নেতা মো. আবুল হাসেম তালুকদারকে প্রধান এবং মো. রেজাউল করিমকে সহকারী প্রধান করে দিনাজপুর জেলা 'জয় বাংলা বাহিনী' গঠিত হয়। বাহিনীর জেলা রিক্রুটিং ক্যাম্প হিসেবে শহরের তৎকালীন এম. এ. টি ক্লাব ভবনটি (দিনাজপুর একাডেমি হাই স্কুলের পশ্চিম-মার্কেট) ব্যবহার করা হয়। জয় বাংলা বাহিনীর ট্রেইনার হিসেবে সহযোগিতা করেন তৎকালীন জেলা আনসার-বাহিনীর

সহকারী এডজুটেন্ট মো. আব্দুর রশিদ। জয় বাংলা বাহিনীতে ছাত্রলীগের সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন স্কুল-কলেজের পি.এম.সি.সি, ক্যাডেট ও স্কাউট সদস্যরা যোগ দেন। ১০ মার্চ থেকে একাডেমি হাই স্কুল, দিনাজপুর মহিলা কলেজ ও দশমাইলের পূর্বে সাদীপুর ঈদগাহ মাঠে জয় বাংলা বাহিনী আধা-সামরিক ট্রেনিং নিতে শুরু করে। মো. আব্দুল মজিদ, রণজিৎ, দবির ও শাখাওয়াত হোসেন-সহ প্রমুখ মিলিত হয়ে দশমাইলে জয় বাংলা বাহিনীর একটি টিম গঠন করে। উক্ত টিমকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য দিনাজপুর সদর থেকে মো. হাবিবর রহমানকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

১৫ মার্চ থেকে জেলাশহরের নিরাপত্তা-সহ ট্রাফিক ও রেলওয়েতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে সাবের আলী, শাহ আলম, আনোয়ার হোসেন শাকু, আবুল, আঙ্গুর, মানিক, মোকসেদ, লাল, আমজাদ, তসরিফুল, এমদাদ, আমিন, শাকু, শাখওয়াত হোসেন, মোজাম্মেল, বজলু, শফিউর রহমান, আবু তালেব মনু, হামিদুর রহমান, আবদুর রহমান, আয়য়ুব আলী, আক্তার আলী, ছন্দ, মসলেম, সাইফুদ্দিন আকতার, সাইদুল, কুদ্দুস, ওয়াকিল, নুরু, জাহানী, লতিফ, মাজেদুর প্রভৃতির নেতৃত্বে বিভিন্ন টিমকে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং টিমগুলো কাজ করতে শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর মুখপাত্র হিসেবে ২৩ মার্চ ছাত্রলীগ নেতাদের সমন্বয়ে 'স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' সারাদেশে পাকিস্তান দিবস প্রত্যাখ্যান করে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ নেয়। ২৩ মার্চের কর্মসূচি দিনাজপুরে সফল কারার জন্য জেলা ছাত্রলীগ ব্যাপক কর্মসূচি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে ২২ মার্চ গনেশতলাস্থ জেলা ছাত্রলীগ কার্যালয় থেকে মাইকিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। মাইকিং করেন খালেকুজ্জামান খোকন, মঈনুল হক, জাফরউল্লাহ, রেজউন্নবী সরকার রঞ্জু, মিন্টু প্রধান। কর্মসূচি অনুযায়ী ২৩ মার্চ সকাল ১০টায় জেলার তৎকালীন সংসদ সদস্যগণ, আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, জয় বাংলা বাহিনী, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ-সহ অন্যান্য সংগঠনের নেতা-কর্মী, সদস্য এবং সর্বস্তরের ছাত্র-জনতার উপস্থিতিতে দিনাজপুর ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণ ভরে ওঠে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা-সহ জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে তৎকালীন এমএনএ, যৌথভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন এবং জেলা জয় বাংলা বাহিনীর গার্ড-অব-অনার গ্রহণ করেন। গার্ড-অব-অনার পরিচালনা করেন মো. শুকুর চৌধুরী। অতঃপর জয় বাংলা বাহিনী মার্চপাস্টের মাধ্যমে জেলাশহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মার্চপাস্টের পর পূর্ব-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী- তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতা মো. আমজাদ হোসেন, শফিউল আলম প্রধান এবং জেলাপর্যায়ের নেতা মোজাফফর হোসেন খান (মজু), আব্দুর রহিম সরকার, মো. মাকসেদুর রহমান, মো. আবুল কাশেম অরু-সহ প্রমুখের নেতৃত্বে ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণ থেকেই ছাত্রলীগের একটি জঙ্গীমিছিল, কোতয়ালী থানা এবং ডিসি অফিস ভবন থেকে পাকিস্তানের পতাকা

নামিয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করে। পতাকা উত্তোলনের শুভ কাজটি সম্পাদন করেন যথাক্রমে মো. মইনুল হক এবং মোজাফফর হোসেন খান (মজু)। দুপুরে মো. আবুল কাশেম অরুর নেতৃত্বে একটি টিম বালুয়াডাঙ্গাস্থ পাকিস্তানি অফিসারের বাসভবনে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। দিনাজপুর সরকারি কলেজের তৎকালীন ছাত্র সংসদের ভিপি, ছাত্রলীগ নেতা হামিদুর রহমান-এর নির্দেশে সরকারি কলেজ ছাত্রাবাসে মো. জাফরউল্লাহ স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। পরিচয়পত্রটির মনোগ্রাম ডিজাইন-কাঠে খোদাই করেন তৎকালীন জেলা ছাত্রলীগ নেতা মকবুল হোসেন। এছাড়াও স্বাধীন বাংলার পতাকা তৈরির জন্য মালদহপট্টির কাপড় ব্যবসায়ীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিনামূল্যে ছাত্রলীগকে কাপড় প্রদান করেন। পতাকা সেলাই করেন স্থানীয় কয়েকজন সাহসী দর্জি। পতাকাটির লাল বৃত্তের মাঝখানে বাংলাদেশের মানচিত্র এবং জয় বাংলা বাহিনীর পরিচয়পত্রটি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খাজি ভাই তার গুদরিবাজারস্থ তাজ প্রিন্টিং প্রেস ও ভিন্ন মালিকানাধীন পার্শ্ববর্তী বর্ণালী প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রণ করে দেন।

২৩ মার্চ ১৯৭১, দিনাজপুরের অনুষ্ঠানে দিনাজপুরের বিভিন্ন থানা থেকে যেসব ছাত্রলীগ নেতা অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- মোস্তাফিজুর রহমান, মনসুর আলী সরকার, মকসেদ আলী শাহ, মাহাবুব চৌধুরী, মতিয়ার, মিজানুর রহমান, আব্দুস সালাম আমান, মহির মন্ডল, মজিবুর রহমান, সাদেক আলী, মকলেসার রহমান, হেফাজ মন্ডল, মজিবর রহমান মন্টু, মো. আব্দুর জব্বার, মোতালেব সরকার, মান্নান সরকার, আবু সাঈদ, ফজলু, ফয়জার রহমান, আব্দুল হাই, নজরুল ইসলাম নজু, জাফরউল্লাহ, সৈয়দ আহম্মেদ, আনোয়ারুল হক চৌধুরী, নাবু, গোপেশ বাবু, ওসমান, বিজয় মহন্ত, তারিকুল ইসলাম, আব্দুল বারী, মোফাজ্জল চৌধুরী, আকবর, মো. আলী, শাহজাহান আলী পটু, খলিল, মো. সাদেক আলী, ফরিদুল ইসলাম, মাহাবুব আহম্মেদ, আব্দুল মজিদ মনা, জাফর আলী, জামিল, মনসুর, আমজাদ আলী, আবু বক্কর সিদ্দিক, কাসু, আজিজার, মেহেরাব, সাইফুল, হুসেন, তাজির, নাজিম, কাদের, মিনু, আব্দুল লতিফ, মোমেন, রতন চৌধুরী-সহ প্রমুখ। এরপর ভারতের শরণার্থী শিবির ও ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোতে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে দিনাজপুরের যুবকেরা ট্রেনিং ও পুনর্বাসন কাজে জড়িয়ে পড়ে। কর্মীদের একটি বিরাট অংশ উক্ত বাহিনীতে যোগদান করে। গেরিলাযুদ্ধ-সহ সম্মুখ-যুদ্ধে দিনাজপুর ছাত্রলীগের কর্মীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ): এই সংগঠনটি চীন মতাদর্শী হলেও মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতার স্বপক্ষ হিসেবে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। দিনাজপুরে সংগঠনটির প্রভাব শক্তিশালী হওয়ায় অসহযোগ-পর্বে দিনাজপুরের অত্যন্ত পল্লী-অঞ্চলে অসহযোগ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ)-

এর উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন: মিজানুর রহমান, মঞ্জুর হোসেন, মোজাম্মেল হক হকো, বিমল কুমার দেব, সৈয়দ মাহবুব হোসেন, মিলু হক, এমদাদুল হক দুলাল, আনিসুল হক ঋজু, মকসেদ আলী মঙ্গোলিয়া, রফিকুল ইসলাম, আব্দুল মজিদ, মোজাম্মেল হক গেড়া, ইভা, জাহাঙ্গীর আলম, জয়ন্তী সরকার, জাহান-ই-গুলশান, তরুণ চক্রবর্তী, আব্দুল হালিম গজনবী, শাহ আলম জীবন, মেহেরুল্লাহ বাদল, এনায়েত-এ-মওলা জিন্নাহ, এনায়েত-এ-পীর রুমি, শামীম ইস্কান্দার, রাবেয়া, পাভেল, আয়য়ুব আলী, গুলনাহার, কামরুল ইসলাম, পপি চক্রবর্তী, হারুন, রাকিব, হাবিবুর রহমান, শরিফুল ইসলাম পটু, ইসমাইল হোসেন পল্টু-সহ প্রমুখ। ঐ সময়ে অসহযোগ-পর্বে জামাল হায়দার সাংগঠনিক কাজে দিনাজপুরে আসেন এবং দিনাজপুরে অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রে তার পার্টি-সহ অন্যান্য ছাত্রদেও মনের ভেতর মুক্তিসংগ্রামের প্রণোদনা তৈরি করেন। ১৩ এপ্রিলের পর অন্যান্য রাজনৈতিক এবং ছাত্র দলগুলোর মতো দিনাজপুরের ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) হায়দার আকবর খানের নেতৃত্বে ভারতে গিয়ে শরণার্থী শিবিরে ভলেন্টিয়ার্স কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। এরপর তাদের মূল সংগঠন ‘কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি’ মুজিবনগর সরকারকে সমর্থন করলে দিনাজপুরের ছাত্র ইউনিয়ন নিজেদের উদ্যোগে গেরিলা ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ): দিনাজপুরের ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ)-এর উল্লেখযোগ্য সদস্য হলেন- তৌহিদুল ইসলাম সানু, জোহাক আলী, মহিউদ্দিন আহমেদ মোহন, আজিজুল ইসলাম চৌধুরী, মো. হাসেম আলী, মো. মোস্তাকিম, পরেশচন্দ্র, হাবিবুর রহমান ভোট, সুনীতি ঘোষ, কামনাচরণ বোস-সহ প্রমুখ। অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই ছাত্র সংগঠনটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে কোনপ্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না রেখে অসহযোগ আন্দোলনের শুরু থেকেই জনসাধারণের মাঝে অসহযোগ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংগঠনটি প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখে। ঐ সময় তারা দিনাজপুর আর্য পুস্তকাগার প্রাঙ্গণে গেরিলা প্রশিক্ষণ নিতে থাকে। ১৩ এপ্রিলের পর সংগঠনটির সদস্যরা অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের মতো ভারতে চলে যায়। সেখানে শরণার্থী শিবির ও ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোতে ভলেন্টিয়ার্স সার্ভিস প্রদান করে এবং গেরিলা প্রশিক্ষণ নিতে থাকে। এরপর ১৭ এপ্রিল মুজিব নগর সরকারকে সমর্থন দেয়। দিনাজপুর ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ)-এর নেতা-কর্মীরা দিনাজপুর-সহ সারাদেশেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

অন্যান্য বাম ছাত্র সংগঠন: দিনাজপুরের অন্যান্য বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (অচিন্ত-দিলীপ), পূর্ব বাংলার ছাত্র ইউনিয়ন (মাহবুবুল্লাহ),

পূর্ব বাংলার বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন (হায়দার আকবর খান রনো)-সহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলো মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

পেশাজীবী সংগঠন: দিনাজপুরের আইনজীবী সমিতি-সহ অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠনগুলো সামগ্রিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে কার্যকর ভূমিকা রাখে। উল্লেখ্য যে, পেশাজীবী সংগঠনগুলোর সদস্যরা স্বাধীনতার স্বপক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকায় তাদের পেশাজীবী সংগঠনের নিজস্ব ব্যানারে সুস্পষ্টভাবে অবদান রাখার সুযোগ পায়নি। তবে এইসব পেশাজীবীরা দিনাজপুরের যেকোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার স্বপক্ষে তাদের অবস্থানকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

সদর উপজেলার পরিচিতি

অবস্থান: ২৫°২৮' থেকে ২৫°৪৮' উত্তর-অক্ষাংশ এবং ৮৮°৩৪' থেকে ৮৮°৪৬' পূর্ব-দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত।

আয়তন: ৩৫৪.৩৪ বর্গকিলোমিটার।

সীমানা: উত্তরে– কাহারোল এবং খানসামা উপজেলা; দক্ষিণে– ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, পূর্বে– চিরিরবন্দর উপজেলা; পশ্চিমে– বিরল উপজেলা।

প্রশাসন: দিনাজপুর সদর থানা গঠিত হয় ১৮৯৯ সালে এবং সেই থানা উপজেলায় রূপান্তরিত হয় ১৯৮৪ সালে।

জনসংখ্যা: এই উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৪৮৪৫৯৭ জন; যারমধ্যে পুরুষ ২৪৭৭৯২ জন (৫১.১৩%), মহিলা ২৩৬৮০৫ জন (৪৮.৮৭%)। মুসলমান ৩৯৮১৫৫ জন (৮২.১৬%), হিন্দু ৭৮০১৮ জন (১৬.০৯%), খ্রিষ্টান ৫৩৯২ জন (১.১১%), এবং অন্যান্য ২৯৭১ জন (০.৬১%)। এই উপজেলায় সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা, মালো, মাহালী, মাহাতো, কড়া, কোল/কর্মকার, ভুঞ্জাল, মুশহর, তুরী, পাহাড়িয়া, রাউতিয়া, ভুঁইয়া প্রমুখ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে।

প্রাচীন নিদর্শন ও প্রত্নসম্পদ: দিনাজপুর রাজবাড়ি, চেহেলগাজী মাজার ও মসজিদ, গোপালগঞ্জ জোড়া গোপাল মন্দির, দিঘন কালী মন্দির, গণেশতলার গণেশজিউ মন্দির, মহিষমর্দিনী মন্দির, গোর-এ-শহিদ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, কালীতলা মশান কালী কেন্দ্রীয় মন্দির উল্লেখযোগ্য।

প্রধান জলাশয়: পুনর্ভবা, গর্ভেশ্বরী ও আত্রাই নদী এবং রামসাগর দীঘি উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বিশ্ববিদ্যালয় ১টি, কলেজ ২৭টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৭২টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৭৪টি, মাদ্রাসা ৩৬টি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উইলিয়াম কেরী নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল (১৭৯৯), দিনাজপুর জিলা স্কুল (১৮৫৩), দিনাজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৬৯), জুবিলি হাই স্কুল (১৮৮৭), মহারাজা গিরিজানাথ উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৩), সারদেশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯২৭), সেন্ট ফিলিপস্ হাই স্কুল (১৯৩০), দিনাজপুর হাই স্কুল (১৯৩০), দিনাজপুর একাডেমি স্কুল (১৯৩৩), সেন্ট যোসেপস্ স্কুল (১৯৫১), সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার হাই স্কুল (১৯৬২), নুরজাহান কামিল মাদ্রাসা (১৯৬৫) উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষার হার: গড় হার ৫৯.৭%; পুরুষ ৬২.৮%, মহিলা ৫৪.১%।

পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী: দৈনিক– উত্তরা, প্রতিদিন, তিস্তা, জনমত, উত্তরবঙ্গ, আজকের প্রতিভা, পত্রালাপ, সাপ্তাহিক- অতঃপর, আজকের বার্তা, মাসিক: নওরোজ (অবলুপ্ত)।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান: ক্লাব ৩০৫টি, লাইব্রেরি ৬টি, জাদুঘর ১টি, সিনেমা হল ৭টি, নাট্যদল ৩টি, সাহিত্যচর্চা সংগঠন ১৫টি, মহিলা সংগঠন ১টি, সাংস্কৃতিক সংগঠন ১৩টি, সাঁওতাল একাডেমি ১টি।

দর্শনীয় স্থান: দিনাজপুর রাজবাড়ি, আনন্দসাগর, শুকসাগর, মাতাসাগর, রামসাগর দীঘি।

জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস: কৃষি ৩৩.২৫%, অকৃষি শ্রমিক ৩.৩২%, শিল্প ১.০১%, ব্যবসা ১৬.০২%, পরিবহন ও যোগাযোগ ৬.০১%, চাকরি ১৪.৭৩%, নির্মাণ ১২.৮৯%, ধর্মীয় সেবা ০.২১%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ০.৬৫% এবং অন্যান্য ১১.৯১%।

কৃষিভূমির মালিকানা: ভূমিমালিক ৪২.১৫%, ভূমিহীন ৫৭.৮৫%। শহরে ৩৫.০৫% এবং গ্রামে ৪৬.৫৫% পরিবারের কৃষিজমি রয়েছে।

প্রধান কৃষি ফসল: ধান, গম, আখ, আলু, সরিষা, শাক-সবজি। বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি পাট, তিল, কাউন। প্রধান ফল-ফলাদি আম, কলা, লিচু। মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার মৎস্য ৪২, গবাদিপশু ১৫, হাঁস-মুরগি ১২৫।

যোগাযোগ: বিশেষত্ব পাকারাস্তা ২০০ কিলোমিটার, আধা-পাকারাস্তা ৫০ কিলোমিটার, কাঁচারাস্তা ৪০০ কিলোমিটার; রেল লাইন ৪২ কিলোমিটার। বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন পাল্কি, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি।

শিল্প ও কলকারখানা: কটনমিল, রাইসমিল, ইটভাটা, অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ, কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, আইস ফ্যাক্টরি, ওয়েল্ডিং কারখানা। কুটিরশিল্প, লৌহ শিল্প, মৃৎশিল্প, কাঠের কাজ, ওয়েল্ডিং কারখানা।

হাটবাজার ও মেলা: হাটবাজার ২০টি, মেলা ৮টি। রেলবাজার হাট, বাহাদুর বাজার, শিকদারগঞ্জ হাট, গোদাগাড়ী হাট, সাহেবগঞ্জ হাট, সাহেবডাঙ্গা হাট, ফাসিলা হাট, পাঁচবাড়ি হাট, খানপুর হাট, নশিপুর হাট ও লক্ষ্মীতলা হাট এবং চেরাডাঙ্গী মেলা, মুরাদপুর মেলা ও গোয়ালহাট মেলা উল্লেখযোগ্য।

প্রধান রপ্তানি-দ্রব্যঃ চাল, লিচু, আম, কলা।

বিদ্যুৎ ব্যবহারঃ এই উপজেলার সবগুলো ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৪১.৫০% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।

পানীয় জলের উৎসঃ নলকূপ ৯৩.১১%, পুকুর ০.১০%, ট্যাপ ২.২৬% এবং অন্যান্য ৪.৫৩%।

স্যানিটেশন ব্যবস্থাঃ এই উপজেলার ৩২.৯২% পরিবার (গ্রামে ১২.৯৪% এবং শহরে ৬৫.১৬%) স্বাস্থ্যকর এবং ২১.৭৭% (গ্রামে ২০.৩৪% এবং শহরে ২৪.০৭%) পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ৪৫.৩১% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রঃ হাসপাতাল ৬টি, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ১০টি, কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৩টি, ডায়াবেটিক হাসপাতাল ১টি, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ২টি, চক্ষু হাসপাতাল ১টি, শিশু হাসপাতাল ১টি, হার্ট ফাউন্ডেশন ও রিসার্চ সেন্টার ১টি, ব্লাড ট্রান্সফিউশন সেন্টার ১টি, পশু হাসপাতাল ১টি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগঃ ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে দিনাজপুরের অনেক ঘরবাড়ি ধ্বংস-সহ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ১৯৬৮ সালের বন্যায় এই জেলার ৯৫% ঘরবাড়ি ও ৯০% ফসলের ক্ষতি হয়। এছাড়াও জেলার রেল-যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলিঃ ১৯৭২ সালের ৬ জানুয়ারি, মহারাজা গিরিজানাথ হাই স্কুলে মুক্তিযুদ্ধ ফেরত মুক্তিযোদ্ধাদের অস্থায়ী ট্রানজিট ক্যাম্পে মাইন বিস্ফোরণে প্রায় ৫ শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হয়। প্রায় ১০০ জন মুক্তিযোদ্ধার ছিন্নভিন্ন লাশ চেহেলগাজী মাজারে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়।

সদর উপজেলার আদিবাসী সমাজ

আদিবাসী এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা মোটামুটি সংঘবদ্ধ হয়ে একটি অঞ্চলে সংগঠিত। যাদের সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং একই সাংস্কৃতিক-অঙ্গনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। তারা সমাজের অভ্যন্তরে ও বাহিরে উভয় ক্ষেত্রে চলাফেরায় স্বকীয় এবং ঐতিহ্য, ভাষা, কৃষ্টি-কালচার ও পোশাক-পরিচ্ছদ সবকিছুকে জীবিত রেখে আধুনিক স্পর্শ ছাড়াই নিজস্বতা আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। তাদের রয়েছে নিজস্ব নিয়ম-কানুন ও প্রথা। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সংজ্ঞানুযায়ী, "নৃ-গোষ্ঠী' হলো তারা, যাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় কম অগ্রসর এবং যাদের জীবনধারা সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিচালিত হয় তাদের নিজস্ব প্রথা ও ঐতিহ্য অনুসারে, তাদের নিজেদের অথবা বিশেষ কোনো আইন বা নিয়ম দ্বারা।"

বিভিন্ন অনুসন্ধান থেকে জানা যায় বর্তমানে দিনাজপুর জেলায় বসবাসকারী ১৭টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রয়েছে। এদের মধ্যে সাঁওতাল আদিবাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ। এরপরেই ওরাওঁদের স্থান। এছাড়াও রয়েছে মুন্ডা, মাহাতো, মাহালী, পাহাড়িয়া, মুশহর, তুরি, মালো, কোল/কর্মকার, রাউতিয়া, ভুঁইয়া ও কড়া। এই আদিবাসীরা ঠিক কী কারণে এদেশে এসে বসবাস শুরু করে সে সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে The Imperial Gazetteer of India-মতে, এইসব আদিবাসীর অনেকগুলোই নিঃসন্দেহে নব্যপ্রস্তরযুগীয় (Neo-Lithic) মানবধারা থেকে উদ্ভূত। উইলিয়াম হান্টার বলেছেন, আদিবাসীসমূহের কিংবদন্তি অনুসারে- উত্তর-পূর্বদিকের দেশগুলো থেকে এসে আদিবাসীসমূহ পূর্ববঙ্গের মধ্যে দিয়ে পশ্চিম অভিমুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেকেই আবার ধারণা করেন (মি. ডাল্টনের মতে) "১৫০০ থেকে ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এদেশে সাঁওতাল, রাজবংশী, মাহালী, পাহান, মুচি, বর্মন, কড়া-সহ প্রভৃতি আদিবাসী এই অঞ্চলে বসবাস শুরু করে।" ইংরেজরা এদেশের শাসনভার গ্রহণ করার পর প্রশাসনিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট হয়। সেই প্রেক্ষাপটে রেললাইন স্থাপনকে কেন্দ্র করে দিনাজপুর অঞ্চলে কড়া, পাহান, ওরাওঁ প্রভৃতি আদিবাসী এই অঞ্চলে আসতে শুরু করে। তাছাড়া এই অঞ্চলের ঝাড়-জঙ্গল পরিষ্কারের প্রয়োজনে স্থানীয় জমিদারেরা বিভিন্ন সময়ে এই আদিবাসীদের এই অঞ্চলে বসবাসের সুযোগ করে দেন। তবে এইসব অভিমত কেবলই মৌখিকভাবে প্রচলিত। এখনও সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এতদ্‌বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। ক্ষেত্র-সমীক্ষার মধ্য দিয়ে দিনাজপুরের আদিবাসীদের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যাবে বলে ধারণা করা যায়। নিম্নে প্রাথমিক অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্য-অনুযায়ী দিনাজপুরের আদিবাসী সম্প্রদায়সমূহের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কিত বিবরণ প্রদান করা হলো:

সাঁওতাল

দিনাজপুরের মোট আদিবাসীর প্রায় অর্ধেকের বেশি সাঁওতাল। শত শত বৎসরের ঐতিহ্যে লালিত জীবন ধারায় অভ্যস্থ নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে আবহমানকাল ধরে এই আদিবাসী বসবাস করে আসছে। সাঁওতাল নামকরণের সঠিক-নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য জানা না গেলেও অধিকাংশের অভিমত হলো, ভারতের সাঁওতাল পরগণার অধিবাসী হিসেবে তারা সাঁওতাল নামে পরিচিত হয়েছে। সাঁওতালদের আদি জাতীয় নাম খেরোয়াড়।

সাঁওতালরা নিজেদের হড় হপন (মানব-সন্তান) বলে পরিচয় দেয়। নৃবিজ্ঞানীগণের মতে, সাঁওতালরা প্রটো-অস্ট্রোলয়েড নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই আদিবাসীরা কোনো একসময় অস্ট্রেলিয়া থেকে এসে অত্র উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে বসবাস করতে থাকে। সেই সূত্র ধরে তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করছে। যদিও উপমহাদেশের সাঁওতালদের আগমন কোথা থেকে, কখন এবং কীভাবে হয়েছে এই ব্যাপারে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। তথাপি এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য থেকে এদেরকে অস্ট্রোলয়েড নরগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়।

সাঁওতালদের দেহের উচ্চতা মাঝারি ধরনের। এদের মুখগহ্বর বড়, গাঁয়ের রং গাঢ় কটা বাদামি, আবার কারো কারো কালো। মাথার খুলি গোল, নাক চ্যাপ্টা, ঠোঁট পুরু ও চোখ ছোটো। চুল কালো ও উস্কোখুস্কো কোঁকড়ানো, মুখে দাঁড়ি-গোফ কম। সাঁওতাল আদিবাসী মোট ১২টি গোত্রে বিভক্ত। যথা: কিস্কু, হাঁসদা, মুরমু, মার্ডি, হেমব্রম, সরেন, টুডু, বাস্‌কে, বেসরা, চোঁড়ে, সোয়ালে (বেদেয়া) ও পাওরিয়া। এই ১২টি গোত্র আবার ২৩৭টি উপগোত্রে বিভক্ত। এসব প্রধান গোত্র ও উপগোত্রের উদ্ভব সম্পর্কে তাদের মধ্যে বিভিন্ন কাহিনি ও কিংবদন্তি প্রচলিত আছে।

সাঁওতাল সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত। পিতার মাধ্যমেই সন্তানের পরিচিতি ও উত্তরাধিকারিত্ব নির্ণীত হয়। এই সমাজে মায়ের চেয়ে পিতার কর্তৃত্ব অধিক হওয়ায় পুরুষেরাই সর্বতোভাবে সমাজের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে থাকে। সাঁওতালদের সমাজে পিতার সম্পত্তিতে পুত্রদের সমান উত্তরাধিকার থাকে, কিন্তু ঐ সম্পত্তিতে কন্যাদের কোনো অধিকার নেই। সঙ্গতকারণে বিয়ের পরবর্তীতে স্বামীর সম্পত্তির ওপর তাদেরকে (স্ত্রীকে) নির্ভর করতে হয়। তবে সম্পত্তি বন্টনের সময় পিতা কন্যাকে একটি গাভী প্রদান করে। কোনো কোনো পুত্রহীন ব্যক্তির সম্পত্তি তার সহোদর ভাইয়েরা পায়। অর্থাৎ হিন্দু দায়ভাগ আইন-মতে, সাঁওতালদের পৈত্রিক-সম্পত্তি ভাগ-বন্টন হয়।

সাঁওতালেরা মূলত বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে থাকে। তারা গৃহদেবতা, গোত্রীয় দেবতা ও সূর্য দেবতার পূজা করে থাকে। তারা যে কোনো মঙ্গল-অমঙ্গলের জন্য সূর্যকে দেবতাজ্ঞানে বিশ্বাস করে। এছাড়াও অন্যান্য কাজের জন্য আরও নানা দেবতা রয়েছে। এদের পূজা-পার্বণে তারা বিভিন্ন ধর্মীয়-উৎসব পালন করে। তাদের

মতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা হলো- ঠাকুরজীউ আর জাতিগত দেবতা 'মারাঙবুরু'। সাঁওতালেরা পরলৌকিক জগতে বিশ্বাসী হওয়ায় তারা স্বর্গ-নরকে প্রগাঢ় আস্থাশীল। প্রতি পূজা শেষে মারাঙবুরু-কে অবশ্যই পূজা দিতে হয়। তিনি মানুষের সকল কর্মের সাক্ষী ও কল্যাণকামী।

সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য ভাত। এছাড়াও সাঁওতালেরা শুকর, ভেড়া, ছাগল, হাঁস, মুরগি, কাছিম, কাছিমের ডিম, মাছ, কাঁকড়া, খরগোশ, হরিণ, কুচিয়া খেতে পছন্দ করে। মুড়া, বাতাসা, খাঁজা, গজা, প্রভৃতি তাদের প্রিয় খাদ্য। হাড়িয়া প্রধান পানীয় এবং উক্ত পানীয় নিজেরা ভাত পচিয়ে বিশেষ ঔষধ-সহকারে প্রস্তুত করে।

ওরাওঁ

নৃতাত্ত্বিক বিবেচনায় ওরাওঁদেরকে প্রাক-দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা হয়। আধুনিক নৃতত্ত্ববিদদের মতে, ওরাওঁ-সাঁওতাল এবং মালপাহাড়িয়া-সহ প্রভৃতি আদিবাসী জাতিকে আদি-অস্ট্রেলীয় (Pro-Australiod) গোষ্ঠীভুক্ত বলেও গণ্য করা হয়েছে। তাদের ধারণা, এই শ্রেণির মানুষ অস্ট্রেলিয়া থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। এইজন্য তাদেরকে অস্ট্রেলীয় মানবগোষ্ঠী বলা হয়। তা-সত্ত্বেও ওরাওঁরা মূলত কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত তা নিশ্চিত করে বলা বড়ই মুশকিল। ড. গ্রীয়ারসন এদেরকে মুন্ডাদের অন্যতম শাখা বলে উল্লেখ করেছেন।

ওরাওঁদের নামকরণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা কোন ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারেননি। তবে নৃ-তাত্ত্বিকেরা এই ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন যে, তারা এই অঞ্চলের ভূমির মানুষ। ওরাওঁদের আদি-বসতিস্থান দক্ষিণ ভারতের ডেক্কানের কংকা নদীর তীরে। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র রায়, পি. দেহান এবং কর্ণেল ডাল্টন বলেন, ওরাওঁ জনগোষ্ঠীর লোকেরা ভারতের ডেক্কানের কংকা নদীর উপকূল থেকে যাত্রা শুরু করে কর্ণাটকায় কিছুকাল অবস্থান করে। অতঃপর কখন যে তারা এই অঞ্চলে আগমন করেছে. তা এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কেউ কেউ অনুমান করে যে, মোগল-আমলে মুসলমানগণ কর্তৃক বিতারিত হয়ে তারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এখন কিছু-সংখ্যক ওরাওঁ বাংলাদেশের বিভিন্ন লোকালয়ে যেমনঃ দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ-সহ বিভিন্ন জেলাতে আশ্রয় নিয়ে বসবাস শুরু করে। তুলনামূলক বিবেচনায় রংপুর ও রাজশাহীতে এদের সংখ্যা অধিক। অতীতে এদেরকে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসবাস করতে দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানে শুধু উক্ত জেলাগুলোতেই বসবাস করতে দেখা যায়। তবে চা বাগানেও অনেক ওরাওঁ বসবাস করে। এদের আদিনিবাস ছিল ভারতের বর্তমান ঝাড়খন্ড, ছোট নাগপুর ও রাজমহল-সহ প্রভৃতি অঞ্চলের পার্বত্য এলাকায়। দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ, কাহারোল, পার্বতীপুর, বিরামপুর, হাকিমপুর, ঘোড়াঘাট এবং দিনাজপুর সদর উপজেলায় ওরাওঁদের বসবাস।

ওরাওঁ সম্প্রদায় ৬৫টি গোত্রে বিভক্ত। যথা: তিরকী, মিনজী, তিগ্যা, কুজুর, লাকড়া, কিসপট্টা, বসাক, এক্কা, বারার, কেরকেটা ইত্যাদি। ওরাওঁ গোত্রের ভেতর সাঁওতাল গোত্রের মতো বহু উপগোত্র দেখা যায়। ওরাওঁদের গায়ের রং কালো। নাক খাঁদা ও চ্যাপ্টা। চুল প্রায় কোঁকড়ানো। মাথার খুলি গোলাকৃতি এবং দেহের উচ্চতা মাঝারি ধরনের।

ওরাওঁদের আহার্য এবং পানীয়ের মধ্যে ভাত ও হাড়িয়া প্রধান। হাড়িয়া এরা নিজেরাই তৈরী করে ভাত পঁচিয়ে। এইজন্য কোনো কোনো অঞ্চলে হাড়িয়াকে পঁচানীয় বলা হয়। ভাত ও হাড়িয়া ছাড়া ওরাওঁরা শাক-সবজি, শামুক, মাছ, জীব-জন্তু ও পশু-পাখির মাংস খায়। গোত্রভেদে ওরাওঁদের কতগুলো বাঁধা-নিষেধ মেনে চলতে হয়। তাদের পূজা-পার্বণ এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে হাড়িয়া ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য। ওরাওঁদের মৃতদেহ দাহ করার সময় যে অনুষ্ঠান পালন করা হয় তাতেও হড়িয়া পান করা হয়।

ওরাওঁ সমাজের মতে, ‘ধরমী’ বা ‘ধরমেশ’ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি সর্বশক্তিমান (Supreme Being)। তার ইচ্ছায় সবকিছু ঘটে থাকে। তিনি সূর্যে অবস্থান করেন। ওরাওঁ-সমাজ সূর্যকে দেবতা হিসেবে জ্ঞান করে এবং তাদের বিভিন্ন পূজা-পার্বণেও সূর্যের প্রাধান্য থাকে। ধরমেশ ছাড়াও ওরাওঁ সমাজে গ্রাম-দেবতা, গার্হস্থ্য দেবতা, ফসলাদি সংরক্ষণের দেবতা, অরণ্য দেবতা-সহ প্রভৃতির উচ্চ-আসন সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়াও হিন্দু ও সাঁওতালদের প্রধান প্রধান দেবতার প্রতিও তারা শ্রদ্ধাবান।

মুন্ডা

মুন্ডারা বাংলাদেশের দিনাজপুর, মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলায় বাস করে। তাদের আদি-পিতৃভূমি ছিল ভারতের ছোট নাগপুর ও বিহারের রাজমহল পাহাড়ী এলাকায়। দৈহিক গঠনে মুন্ডাদের গায়ের রং কালো, নাক প্রস্থ , ঠোঁট মোটা এবং মুখে দাঁড়ি-গোঁফ খুব কম হয়। লোকগুলো খুব শক্তি-সামর্থপূর্ণ; দৈহিক উচ্চতা মাঝারি। শারীরিক গঠন ও আকৃতি বিবেচনা করলে প্রাচীন ভারতের আদিম লোকেদের সাথে মুন্ডাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

মুন্ডা আদিবাসী কয়েকটি দলে বিভক্ত; এই দলগুলোকে মুন্ডাদের ভাষায় ‘কিলিং’ বলা হয়। মুন্ডাদের বিশ্বাস, তারা সকলেই একই পূর্বপুরুষ হতে এসেছে। বিধায় অন্য কিলিং লোকেদের সাথে তারা কোনোক্রমে বিবাহ-বন্ধন স্থাপন করতে পারে না। শুধু তাই নয়, এক কিলিং (দলের) লোকদের সহিত অন্য কিলিং লোকজনেরা অবাধে খাওয়া-দাওয়া এবং ওঠা-বসা কারার ব্যাপারেও মুন্ডা-সমাজব্যবস্থায় ব্যাপক ধরাবাঁধা নিয়ম রয়েছে। যেগুলো তারা মনে-প্রাণে মেনে চলার চেষ্টা করে।

মুন্ডাদের বিশ্বাস 'সিঙবোঙা' (সূর্য দেবতা) হলো দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি তাদের আদি পিতা-মাতাকে সৃষ্টি করেছেন। এই ধরনের অগাধ বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে মুন্ডাদের মাঝে দীর্ঘ কাঁথা বা পৌরাণিক বহু কাহিনি রয়েছে। সিঙবোঙ্গা হলো স্বর্গমর্তের মালিক। মানবজাতির স্রষ্টা এবং সর্ব-শক্তিমান। তারা মনে করে, মুন্ডা সমাজের প্রতিটি গ্রাম-বাড়ী-পরিবার এমনকি ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে একজন করে আলাদা দেবতা রয়েছে। তাদের ভাষায়- গ্রামের দেবতাকে 'ওরাবোঙা', পরিবারের দেবতাকে 'আচারিবোঙ্গা' বলা হয়। এইসব দেবতারা বিবাহিত দম্পতির সুখ-শান্তি সার্বক্ষণিকভাবে রক্ষা করে। তারা মনে করে, কোনো বিবাহিত মেয়ে যদি কখনো তার নিজের পিতৃগৃহের কোনোকিছু চুরি করে তখন দেবতা রেগে গিয়ে তাদের সংসারে অমঙ্গল (অশান্তি) ডেকে আনে। এইসব দেবতাগুলো ছাড়াও বুরুবোঙা, ইতরবোঙা নামে অন্যান্য দেবতাও রয়েছে, যারা সাধারণ মানুষের মঙ্গল করলেও রেগে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে মানুষের অমঙ্গলের বন্যা বয়ে আনে বলে মুন্ডাদের বিশ্বাস। এগুলো ছাড়াও মুন্ডারা প্রাকৃতিক নিত্য-নৈমিত্তিক চাষাবাদ, গরু-বাছুর, অসুখ-বিসুখ ইত্যাদির জন্য পৃথক পৃথক দেবতাকে পূজা করে থাকে। কারণ তাদের পূর্বপুরুষেরা এইধরনের দেবতাকে একান্তভাবে বিশ্বাস করেছিল। মুন্ডারা মনে করে, এই দেবতারা যেমন সুখ-শান্তি, প্রাচুর্য-সহ প্রভৃতি আনতে পারে, তেমন অজন্মা, আনাবৃষ্টি, আশান্তি, অসুখ-বিসুখ, বিপদ-আপদও তারাই ঘটিয়ে থাকে। মুন্ডারা হিন্দুদের লক্ষ্মী ও সরস্বতীদেবীর পূজার আয়োজন করে বলেই ধর্মের দিক দিয়ে হিন্দুদের সাথে মুন্ডারা নৈকট্যবোধ করে থাকে।

মুন্ডা সমাজে উত্তরাধীকারী নির্ণীত হয় পুরুষ বংশানুক্রমে। তাদের রীতিতে পিতার মৃত্যুর পর ছেলে সন্তানেরাই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধীকারী হয়। তবে মৃত্যুর পূর্বে পিতা কন্যার বা তার স্বামীকে কোনো সম্পত্তি দান করলে তারা সেই সম্পত্তির অধিকারী হয়।

মাহাতো (বেদিয়া/কুর্মি)

মাহাতো জনগোষ্ঠীর পূর্বনাম ছিল কুর্মি ও বেদিয়া। কুর্মি ও বেদিয়া থেকে কীভাবে শুধু মাহাতো নামকরণ হলো তা আজও অজানা। এদেশে কুর্মি ও বেদিয়া নাম প্রচলিত নয়, মাহাতো নামটি পরিচিত। ভারতে বেদিয়া মাহাতো ও কুর্মি মাহাতো দুটো নামই রয়েছে। যারা বন-জঙ্গল, গাছ, উঁচু-নিচু জমি থেকে কেটে চাষের উপযোগী করে তারাই হলো- কুর্মি। দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, ফরিদপুর, সিলেট, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট-সহ অন্যান্য অঞ্চলেও কম-বেশী মাহাতো জনগোষ্ঠী বাস করে। দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলায় প্রায় ১২৪০ জন মাহাতো আদিবাসী লোকজন বসবাস করে।

মাহাতো সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। পুত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে পিতার গোত্র ও সম্পত্তি লাভ করে। বাংলাদেশে মাহাতো জনগোষ্ঠী প্রধান দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। কুর্মী মাহাতো এবং বেদিয়া মাহাতো। উভয় শ্রেণির ধর্মীয় আচার ও রীতি-নীতির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তবে সামাজিকভাবে তারা এক। মাহাতো সমাজের গণতান্ত্রিক-ব্যবস্থা বিদ্যমান। মাহাতো সমাজব্যবস্থা গ্রাম-ভিত্তিক হওয়ায় গ্রামবাসীরা ছোট-খাটো ঘটনার বিচার করার জন্য মুখপাত্র হিসেবে যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করে। তাকে প্রামাণিক বা মাহাতোয়া বলা হয়। তার অনুমতিতে সবধরনের বিচার অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়।

মাহাতোরা তাদের সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলে মনে করেন। মাহাতোরা ১৭টি গোত্রে বিভক্ত। বাংলাদেশের মাহাতোরা নামের শেষে মাহাতো, মাইতি বা কুর্মি পদবী ব্যবহার করে। এছাড়া সিং, চৌধুরী, মন্ডল, রায়, প্যাটেল, ভশোয়াল, সরকার-সহ বিভিন্ন পদবী রয়েছে। মাহাতোরা আকারে মাঝারি, খাটো। গায়ের রং শ্যামলা। মুখাকৃতি মাঝারি-ধরনের, নাক প্রশস্ত ও মাঝারি খাড়া। অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাহাতোদের জীবন শান্ত প্রকৃতির। তারা সৎ, সহজ-সরল, কর্মঠ ও নিয়মনিষ্ঠ। নিজস্ব সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি মাহাতোদের গভীর শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে।

মাহাতোরা সনাতন ধর্মের অনুসারী। তারা সনাতন ধর্মের রীতিনীতি মেনে চলে। এই ধর্মের বিশ্বাসীরা দূর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী-সহ প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা করে। এছাড়াও মাহাতোরা নিজস্ব রীতি-নীতির কিছু অনুষ্ঠান ও উৎসব পালন করে, যা সনাতন ধর্মের সঙ্গে মেলে না। মাহাতোদের ধর্মগ্রন্থ হলো- বেদ, গীতা। এছাড়াও রয়েছে আইন্যাশ। সাধারণত মৃত্যুর পরে আইন্যাশ পাঠ করা হয়। মাহাতোরা পূজারীকে বলেন মাইয়র। যিনি দীক্ষা দেন তাকে বলে সান্তাগুরু। সান্তাগুরু আইন্যাশ পাঠ করেন।

মাহাতোদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ। এর পাশাপাশি শুকর, কাঁকড়া, কবুতর ইত্যাদি তাদের প্রিয় খাদ্য। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা হাড়িয়া পান করে থাকে। মাহাতোরা হাড়িয়াকে চুয়ানী বলে। অন্যান্য প্রচলিত খাবার তারা খেয়ে থাকে। তারা আইরম পিঠা নামে এক ধরনের পিঠা তৈরী করে যা কয়েক মাস পর্যন্ত রেখে খাওয়া যায়।

মাহালী

মাহালী আদিবাসী নামের 'মাহালী' শব্দটি সাঁওতাল ভাষায় মহল শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হচ্ছে বাঁশ। মাহলীরা ঝুড়ি নির্মানকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে এবং বাঁশ জাতীয় বা বাঁশকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করে থাকে। সে কারণে তাদেরকে মাহালী বলে ডাকা হয়। দিনাজপুর জেলায় বোচাগঞ্জ, বীরগঞ্জ,

পার্বতীপুর, হাকিমপুর, ঘোড়াঘাট ও দিনাজপুর সদর উপজেলায় মাহালীদের বসবাস।

মাহালী আদিবাসী বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। এইচ. এইচ. রিজভী 'The Tribes and Casters of Bengal' গ্রন্থে প্রায় চৌত্রিশটি মাহালী গোত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। তাদের বিভিন্ন গোত্রের নাম মাহালী ভাষায় বিভিন্ন প্রতীক দিয়ে বোঝানো হয়। যেমনঃ হেমরম- সুপারী, হাঁসদা (হাঁসদা)- বুনোহাঁস, মারডী (মারাডি)- নীলচক্রপাখি, কিস্কু (কার্কুস)- মাছরাঙ্গা পাখি, বাস্কে (বাস্কি)- লাল নটে শাক, সরেন- সপ্তর্ষি, বেসরা- বাজপাখি, মুর্মু (ডুমুরী)- শোল মাছ, টুডু (বারে)- ইঁদুর, চঁড়ে- টিকটিকি প্রভৃতি।

মাহালীদের মাতৃভাষার নাম মাহালে। মাহাল ভাষা মৌখিক ভাষা। এই ভাষার কোন লিখিত বর্ণ নেই। সম্প্রতিকালে কোন কোন ক্ষেত্রে মাহালে ভাষাকে ইংরেজীতে লেখা হচ্ছে।

মাহালীদের প্রধান খাদ্য ভাত। দৈনন্দিন জীবনে এরা সাধারণ ভাত, মাছ, শুকরের মাংস, চিংড়ি ও শুটকি মাছ খায়। বেগুন দিয়ে শুটকি রান্না করে খেতে ভালোবাসে। ঝাল, লবণ অথবা পেঁয়াজ পুড়িয়ে বেটে একধরণের ভর্তা খায়। তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী খাবার হিসেবে শামুক, ঝিনুক, কচ্ছপ, কাকঁড়া, শুকরের মাংস এবং বিভিন্ন ধরনের মাছ খায়।

মাহালীরা সনাতন ধর্ম পালন করে। তাদের উদ্‌যাপিত পূজার মধ্যে সিঞাবোঙ্গা (সূর্য) পূজা, ওড়াক্‌বোঙ্গা (গৃহ দেবতা) পূজা, ধরম দেবতার পূজা, গেরাম ঠাকুর পূজা, যুগিনী পূজা, মনসা পূজা, দূর্গা পূজা উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে অধিকাংশ মাহালী খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে।

পাহাড়িয়া

পাহাড়িয়া একটি আর্য-ভারতীয় শব্দ। অরণ্য বা পর্বতে বসবাসকারী লোকদের বোঝাতে এটি ব্যবহৃত হয়। পাহাড়িয়াদের দাবী অনুযায়ী তাদের উৎপত্তিস্থল হলো উত্তর বিহারের রাজমহল পর্বতমালা। ইতিহাস থেকে জানা যায় পাহাড়িয়ারা ছিল একটি বঞ্চিত জনগোষ্ঠী। সামান্য চাষাবাদ ও বিস্তৃত বনভূমি থেকে আদিম পদ্ধতিতে খাদ্য সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। খাদ্যাভাবের সময় তারা জঙ্গলের বিভিন্ন কন্দ, ফলমূলের উপর নির্ভর করতো। দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলায় প্রায় ২২২০ জন পাহাড়িয়া বসবাস করে। অন্যত্র এদের বসবাস নেই।

পাহাড়িয়া প্রায় ১০০ বছরের পুরোনো খ্রিষ্টান। বাংলাদেশের পাহাড়িয়াদের অধিকাংশই খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী। তবে তাদের আচার আনুষ্ঠানের সাথে সনাতন ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের মিশ্রণ ঘটেছে। অন্যদিকে খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী পাহাড়িয়ারা তাদের

কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যে খ্রিষ্টান ধর্মীয় মূল্যবোধ রপ্ত করে ফেলেছে। ধর্ম ও ধর্মগুরুর প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধা রয়েছে।

পাহাড়িয়ারা গোত্রকে কূল বলে। মূলত তারা চারটি কূলে বিভক্ত। সেগুলো হলো- বালকো, গোড়, কচলু ও ককেকো। তারা বেশীরভাগ সিং পদবি ব্যবহার করে। তবে আজকাল কেউ কেউ নাম কিংবা পদবির পরে 'পাহাড়িয়া' শব্দটি সংযোজন করছেন।

পাহাড়িয়াদের সমাজ-ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। তবে বিবাহের পর ছেলে ইচ্ছে করলে আলাদা সংসার করতে পারে। সমাজে অবিবাহিত ভাই-বোন থেকে বিবাহিত ছেলের দায়িত্ব বেশি থাকে। মেয়েরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না। তবে পরিবারের যদি কোন পুত্রসন্তান না থাকে তাহলে বাবার সম্পত্তি মেয়েরা ভোগ করতে পারে, কিন্তু ভাইদের অনুমতি ছাড়া বিক্রি করতে পারে না। আবার বোন মারা গেলে সম্পত্তি ভাইদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। পরিবারে যদি শুধু মেয়েসন্তান থাকে তখন ঘর-জামাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সেই ক্ষেত্রে মেয়ে ইচ্ছে করলেই তার স্বামীকে সম্পত্তি লিখে দিতে পারে।

মুশহর

প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী রিজলি'র মতে, মুশহর জাতিগোষ্ঠী আদি অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। যাদের অন্যতম শাখা "ভূঁইয়া' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। আনুমানিক দেড়শো বছর আগে জীবিকার সন্ধানে মূলত রেললাইনের জন্য মাটি কাটার শ্রমিক হিসেবে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। পরে কৃষি-কর্ম ও পালকি বহনকে তাদের জীবিকা হিসেবে বেছে নেয়।

বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ ও বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন জেলায় মুশহর জাতির বসবাস রয়েছে। এরমধ্যে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরের খোলাহাটি, বীরগঞ্জ থানার ভাবকী, কবিরাজ হাট, বিরল থানার ধুকুরঝাড়ি, বাজনাহার, মোল্লাপাড়া, দিনাজপুর সদরের কাউগাঁ, কিষানবাজার, জয়দেবপুর এমনকি বোচাগঞ্জ ও বিরামপুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মুশহর জাতি অধিক সংখ্যায় বসবাস করে। মুশহরদের মতে, তাদের সমাজ ৫টি গোত্রে বিভক্ত। সেগুলো হচ্ছে- ঋষিমনি, মোংগাইয়া, ত্রিহুতিয়া, বগুচিয়া ও ছাপড়াইলা। এশিয়াটিক সোসাইটির নৃগোষ্ঠীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, মুশহর সমাজ ছয়টি উপগোত্রে বিভক্ত; রিখিয়াশান, মাসহিয়া, ত্রিহুতিয়া, খারওয়ার, দরওয়ার এবং ঘাটোয়া।

মুশহর সমাজে অতীতে যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে অন্য সংস্কৃতির প্রভাব, দারিদ্র ইত্যাদি কারণে পরিবাগুলো ভেঙে একক পরিবারে রূপান্তরিত হচ্ছে। মুশহর সমাজ মূলত পিতৃতান্ত্রিক। কর্মক্ষম পিতা-মাতার ভরণপোষণের দায়িত্ব সন্তানেরা বহন করে না।

যদিও দ্রাবিড়ীয় জনগোষ্ঠী প্রকৃতি পূজারী, কিন্তু মুশহরদের ধর্মাচার বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তারা প্রকৃতি পূজা হতে ধীরে ধীরে সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছে। মুশহররা কালী পূজাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তারা সনাতন ধর্মের বিভিন্ন পূজা করে থাকে। তাদের প্রধান আরাধ্য দেবতা হলেন শিব। এছাড়া তারা সূর্য পূজা, কালি পূজা, দূর্গা পূজা, ছট পূজা, বিষহরী/মনসা পূজা করে থাকে। মুশহরদের ধর্মপালনে দেবদেবীদের প্রাধান্য রয়েছে। সংকটকালে তারা ভাবগানের কাছে মানত বা পূজা দিয়ে থাকে। মানতে তারা পাঠা বলি দেয়।

তুরী

তুরী জাতির লিখিত ভাষা-অক্ষর নেই। লিখিত কোনো ইতিহাসও নেই। বয়স্কদের মুখে শোনা কথাকে ভিত্তি করে (পূর্বপুরুষ বা বাপ-দাদার মুখে যা শুনেছেন) তাদের জাতির উৎপত্তি বিষয়ে কিছু অবহিত হওয়া যায়। 'রাজার' লোকেরা তাদের জিজ্ঞাসা করে, 'তোরা কী জাত?' তখন জবাব দেয়, আমরা 'তুরই জাত (অর্থাৎ তোর-ই বা তোমাদেরই জাত বা লোক)। সেখান থেকে পাহাড়ি বন-বাদাড়ের এই জনগোষ্ঠী পরিচিত হতে থাকে তুরী জাতি হিসেবে। তাদের দাবি তারা রাম-এর বংশধর। লব-কুশ (রামের পুত্র) থেকে এদের 'সৃষ্টি' বলে তারা মনে করে। এদের বিয়ের চাদরে লব-কুশ থাকে প্রতীকীরূপে।

এদেশে আদিবাসী তুরী সম্প্রদায় আসে ভারতের ছোট নাগপুর থেকে। সেখানেই তাদের মূল আবাসভূমি। পরবর্তীতে দিনাজপুর, মালদহ এবং জলপাইগুড়ির প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। বাংলাদেশে বৃহত্তর রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ, ও জয়পুরহাটের পাঁচবিবি রেল-স্টেশনের আশে পাশে রেলের খাস জমিতে জঙ্গল কেটে এরা স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে। দিনাজপুর জেলার দিনাজপুর সদর, বোচাগঞ্জ, চিরিরবন্দর, বিরামপুর উপজেলায় ২০৩৫ জন তুরী বসবাস করে।

নৃবিজ্ঞানীদের মতে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তুরী একটি অন্যতম সম্প্রদায়। এদের ধর্মবিশ্বাস এথেমিক (প্রকৃতি পূজারী) অর্থাৎ জড়োপাসনা করা। আবার তুরী আদিবাসীর কিছু মানুষকে হিন্দু ধর্মালম্বীর অনুসারী মনে হয়। তারা হিন্দু ধর্মালম্বীর প্রধান উৎসব দূর্গা পূজা, নারায়ণ পূজা, ডালা পূজা ইত্যাদি সানন্দে উদযাপন করে থাকে এবং স্বত্বঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকে। তুরীদের বর্তমানে অভাবের তাড়নায় ধর্মান্তরিত হতে দেখা যায়।

প্রচলিত নিয়মে তুরীদের মধ্যে জমি-সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় পুত্র। কন্যাসন্তান সম্পত্তির কোন ভাগ পায় না। যদি পুত্রসন্তান না থাকে তখন কন্যাসন্তান জমির মালিক হয়। নিঃসন্তান পরিবারে জমি ও সম্পত্তি পায় নিকট আত্মীয়রা। তুরীদের লিখিত ভাষায় বিদেশি ভাষার প্রভাব রয়েছে। মৌখিকভাবে প্রচলিত ভাষায়

পশ্চিমা দেশোয়ালী (তাদের মতে নাগরিক), হিন্দি ও বাংলা ভাষার শব্দাবলীর মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়।

মালো

মালোরা নিউলিথিক যুগের জনগোষ্ঠী। ভাষাগত দিক থেকে তারা প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড জাতি। স্থানীয়রা তাদেরকে বুনো বা বুনা নামে ডাকে। বিহারের মালভূমির আদিবাসী ও মালই টিলার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে এদের জীবনযাত্রার যথেষ্ট মিল আছে বলেই এ জাতির নামকরণ করা হায়েছে মাল বা মালো।

বাংলাদেশের দিনাজপুর, রংপুর, জয়পুরহাটের পাঁচবিবি, উচাই, পলিচাদপুর, চাঁদপুর, পাথরঘাটা, বীরনগর, বদলগাছি, পাহাড়পুর, নওগাঁ মাহদেবপুর, সোনাপুর, হিলি, শাহজাদপুর, ধানজুরী, দাউদপুর প্রভৃতি এলাকায় মালো জনগোষ্ঠীর বসবাস। এসব এলাকায় মালোদের সংখ্যা অনেক বেশি। কথিত আছে, এই অঞ্চলগুলোতে ব্রিটিশরা যখন রেললাইনের কাজ শুরু করেন, তখন মালোরা রেললাইনের নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে এসে পরবর্তীতে এসব অঞ্চলেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলায় ১৫৫০ জন মালো বসবাস করে।

সাঁওতাল, ওরাওঁ, মাহালী, মুন্ডাদের মতোই তাদের গায়ের রং, মাথার চুল এবং মুখমন্ডলের চেহারা। স্বতন্ত্র কোনো বৈশিষ্ট্য তাদের নেই। মালো জাতি ১৩টি গোত্রে বিভক্ত। গোত্রভিত্তিক তাদের বংশ পরিচয় নির্ধারিত হয়। যেমন: নায়েক, খাসোয়ার, খাটোয়ার সিং, দুয়ারসিনী, হেটখেটিয়া, কার্টাহ বা মুদ্রাকার, ভুঁইএ্যা, পরনদীয়ার, রাজ, অহীব, মন্ডল গোত্র, পরনদীয়ার, সিমের লেকোয়া ইত্যাদি। মালোদের জাতিগত পেশা হলো- মাছ ধরা এবং মাছ বিক্রয় করা। তবে পুকুর না থাকার কারণে এখন আর মাছ বিক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই বর্তমানে অনেকে কৃষিকাজ অথবা দিনমজুরি করে জীবনযাপন করে। মালোরা কৃষি কাজ এবং মাছ চাষ এই ধরনের পেশার সাথে জড়িত।

মালোদের প্রধান খাদ্য ভাত। দৈনন্দিন জীবনে সাধারণত ভাত, মাছ, শুকরের মাংস, মুরগী, শুটকি খায়। ঝাল, লবণ দিয়ে আলু বা বেগুনের ভর্তা খায়। পূর্বে মহিলা-পুরুষ উভয়ই তাড়ি খেতো। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা ঐতিহ্যবাহী খাবারের মধ্যে শামুক, ঝিনুক, কচ্ছপ, কাঁকড়া, শুকরের মাংস ও বিভিন্ন ধরনের মাছ খায়। রান্না সাধারণত বাড়ির কর্ত্রীকেই করতে হয়। অতিথির সামনে তারা নানা ধরনের মিষ্টান্ন পরিবেশন করে। তারা নিজস্ব পদ্ধতিতে এক ধরনের পানীয় তৈরি করে। যার নাম হাঁড়িয়া। হাঁড়িয়া বানানোর জন্য মালোদের নিজস্ব ঔষুধি গাছ আছে। প্রথমে অনেক ধরনের গাছের শিকড় দিয়ে রানুটা হাড়িতে ভাতের সাথে

মিশিয়ে রাখা হয়। তারপর চাল দিয়ে ভাত করে রানুটা হাঁড়িতে ভাতের সাথে মিশিয়ে রাখা হয়। এরপর কয়েকদিনের মধ্যে অন্যরকম গন্ধ বের হয় এবং ভিতরে একধরনের রস তৈরি হয়। এই রসকেই হাঁড়িয়া বলে। এই রসটা খেলে মানুষ মাতাল হয়ে যায়। মালো জনগোষ্ঠী হিন্দু ধর্মের অনুসারী। তারা প্রকৃতির উপাসনাও করে থাকে।

কর্মকার (কামার/কোলকামার)

কর্মকারদের আদি পেশা ছিল লোহার কাজ করা। তৎকালীন রাজা-জমিদারগণ তাদেরকে দিয়ে লোহার কাজ করাতেন। কালক্রমে এটি তাদের ঐতিহ্যগত পেশায় পরিণত হয়। সময়ের বিবর্তনে তারা এখন অন্যান্য পেশায় যুক্ত হলেও যেহেতু পূর্বে তারা কামারের কাজ করতেন, সেহেতু তারা তাদের নামের সাথে কর্মকার উপাধি ব্যবহার করেন।

কর্মকারদের গায়ের রং কালো, উচ্চতা মাঝারি এবং গোলগাল চেহারা হয়। কর্মকার সম্প্রদায়ের সকল নারী-পুরুষ রেওয়াজ-মাফিক কর্মকার পদবী লিখে থাকে। কর্মকারদের মধ্যে ১৩টি গোত্রের নাম জানা যায়। গোত্রগুলো হলো: কুশ গোত্র, চন্দ্র গোত্র, ডুমুর গোত্র, কাইতার বা চিচিঙ্গা গোত্র, সন্তেরথী বা স্বর্ণ ভুঁইয়া, মাছ গোত্র, কমু বা শঙ্ক গোত্র, ষাঁড় গোত্র, বাঘ গোত্র, মৃগ গোত্র, কাছিম গোত্র. সূর্য গোত্র, মটুক বা মুটুক গোত্র।

কর্মকারেরা নিজেদেরকে সনাতন ধর্মাবলম্বী বলে পরিচয় দেয়। হিন্দু ধর্মের সাথে তাদের আচারে অনেক মিল রয়েছে। নিজ ধর্মকে তারা অত্যন্ত সম্মান করে। ধর্মান্তরিত হওয়ার নজির তাদের মধ্যে নেই। বর্তমানে তাদের প্রধান উৎসব দূর্গাপূজা, লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা, দ্বীপান্বিতা পূজা, হোলি উৎসবের পাশাপাশি তারা তাদের ঐতিহ্যগত কিছু পূজাও করে থাকে। যেমনঃ গেরাম পূজা, গোয়াল পূজা, বিষহরি পূজা ইত্যাদি।

কর্মকাররা সাধারণত বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি, ডাল, মাছ ছাড়াও কাছিম. কুচে, শুকর, হাঁস-মুরগি, কবুতর, খরগোশ, খাসি, শামুক, ইঁদুর ইত্যাদি খেয়ে থাকে। তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে শুকরের মাংসের আয়োজন করতে হয়। তা না হলে অতিথি আপ্যায়ন পূর্ণাঙ্গ হয় না। বর্তমানে যারা বিভিন্ন কারণে শহরমুখী হয়েছে, তারা বিয়ের অনুষ্ঠানে খাসির মাংসের আয়োজন করে। অতিথি আপ্যায়নে সাম্প্রতিককালে তারা চায়ের ব্যবস্থা করে। তাদের উৎসবে হাড়িয়ার প্রচলন আছে।

কর্মকারদের নিজস্ব ভাষাকে নাগরী ভাষা বলে পরিচয় দেওয়া হয়। তাদের ভাষায় কোনো অক্ষরলিপি নেই। এ ভাষার তারা পরিবারের মধ্যেই কথা বলে। পরিবারের বাইরে তারা বাংলাভাষায় কথা বলে ।

রাউতিয়া (শিং/রাই)

বাংলাদেশের আদিবাসী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অন্যতম একটি জাতিসত্তার নাম রাউতিয়া। দেশের মানুষের কাছে তাদের পরিচিতি ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ না করলেও বর্তমানে কিছু এনজিও তাদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়।

রাউতিয়া সম্পর্কে বর্তমানে কোন উল্লেখযোগ্য বই-পুস্তক না থাকায় তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলার সরবপুর গ্রামের কিছু রাউতিয়া আদিবাসীদের সূত্র ধরে জানা যায়, তাদের পূর্বপুরুষেরা প্রায় ২০০-২৫০ বছর পূর্বে ভারতের রাঁচি, আসাম, চব্বিশ পরগণা ও পশ্চিম দিনাজপুরে এবং বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে বসবাস শুরু করেছিল। বর্তমানে উত্তরাঞ্চলে দিনাজপুর, নওগাঁ, জয়পুরহাট, নাটোর, পাবনা এবং সিলেট জেলার কিছু জায়গায় রাউতিয়া বা শিং সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। বর্তমানে এদের জনসংখ্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য না পাওয়া গেলেও ব্রিটিশদের দেওয়া তথ্য মতে, বাংলাদেশের ২৬টি গ্রামে আনুমানিক ১০ হাজার রাউতিয়া আদিবাসী বসবাস করে। দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলায় ১৫০ জন রাউতিয়া বা শিং বা রাই আদিবাসী বসবাস করে।

সামাজিকভাবে তারা মাঝি, করহর বা করকহার, রিচি, খাচকা, টেমা, লুঠর, যোগী, নাথিয়া, খাটোয়ার, হরিদুয়ার, শৌল-সহ নানান গোত্রে বিভক্ত। প্রাথমিকভাবে তারা একে অপরের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া না করলেও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিবাহের মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিরাজমান। পিতৃপ্রধান পরিবারে সাধারণত পিতারাই প্রধান। নারীরা কখনও সম্পদের উত্তরাধিকারী হতে পারে না; তবে পুত্রসন্তান না থাকলে কন্যাসন্তান সমস্ত সম্পত্তি লাভ করে।

রাউতিয়ারা হিন্দু ধর্মের অনুসারী হওয়ায় বিভিন্ন পূজা-পার্বণের আয়োজন করে থাকে। নারায়ণ পূজা, কালী পূজা, বড় পাহাড় পূজা, ছট পূজা ইত্যাদি। সব থেকে বড় পূজা হচ্ছে কালী বা সহরাই। টুসু পূজা পূর্ব থেকে এখনও প্রচলিত রয়েছে।

ভুঁইয়া

ভুঁইয়া বংলার ইতিহাসের অংশ হিসেবে খুব বেশিদিনের পুরোনো জাতি নয়। ১৯২১ সালের আদমশুমারীতে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর ও বর্ধমানেই এদের বসবাস বেশি ছিল বলে উল্লেখিত। সর্বমোট ২৬,৬৩৪ জনের তালিকা পাওয়া যায়। ১৯৭১ সালে রাজশাহী, পাবনা, নাটোর, নওগাঁ, বদলগাছি, মহাদেবপুর, ধামইরহাট, পত্নীতলায় এদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। যার সংখ্যা অনধিক ৭ হাজারের মতো। কারও কারও মতে, দিনাজপুর জেলায় বার ভুঁইয়ারা রাজত্ব করতো; সেখান থেকেই এই

ভুঁইয়া নামকরণ করা হয়েছে। দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর, খানসামা, বিরামপুর উপজেলায় ৬৫০ জন ভুঁইয়া বসবাস করে।

ভুঁইয়াদের গাঁয়ের রং, আকার প্রায় একই রকম। এরা সাধারণত ভুঁইয়া, মাঘাইয়া, মাহতো, কুড়মী, সিং ঝিকইয়া, কর্মকার ইত্যাদি পদবী গ্রহণ করে থাকে। রিখিয়াসন ভুঁইয়া থেকে ভুঁইয়া প্রথাগুলো এসেছে। এরা গ্রামে কমিটির মাধ্যমে গ্রাম পরিচালনা করে থাকে। আচার-বিচার নিষ্পত্তির জন্য মাতব্বর বা মোড়ল থাকেন ২ জন।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষেরা সমস্ত মতামত দিয়ে থাকে, তবে মেয়েদের সাথেও আলোচনা করে থাকে। বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়েরা মা বাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও ছেলেরা স্বাধীন মতামত দিতে পারে। বিয়ের পূজার উৎসবে সকলে মিলেমিশে নেচে-গেয়ে উৎসব পালন করে থাকে।

বর্তমানে এদের প্রধান পেশা হচ্ছে দিনমজুর। অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল আদিবাসী ভুঁইয়ারা প্রভাবশালীদের দ্বারা নিষ্পেষিত ও অবহেলিত। জন্ম-সংস্কারের ক্ষেত্রে ভুঁইয়া-সমাজে ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। গর্ভবতীদের সাধ খাওয়ানো তাদের উল্লেখযোগ্য প্রথা। মেয়েশিশু জন্মালে ৫-৬ দিনের মধ্যে শিশুর চুল ছেঁটে সবাই গোসল করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে সবাইকে খিচুড়ী খাওয়ানো হয়।

কড়া

ব্রিটিশ কর্তৃক উনিশ শতকের জরিপে লিপিবদ্ধ আকারে কড়া আদিবাসীদের তথ্য উঠে আসে। তাদের মতে, প্রায় ২০০ বছর পূর্বে উপনিবেশের সময় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কড়া সম্প্রদায়কে ভারত মহাসাগরের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসিত করা হয়। পরবর্তীতে তারা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও অবিভক্ত পূর্ব বাংলার দিনাজপুরে বসবাস করতে শুরু করে। বর্তমানে দিনাজপুর সদর উপজেলার আওলিয়াপুর ইউনিয়নে ১৭০ জন কড়া আদিবাসীর বসবাস রয়েছে।

কড়া সম্প্রদায় সামাজিকভাবে একক পরিবারে বসবাস করতে বেশি পছন্দ করে। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে পিতাই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ায় ছেলেরা মেয়েদের বাড়িতে গিয়ে যথারীতি সনাতন ধর্মের নিয়মানুসারে নিজ গোত্রে বিবাহে আবদ্ধ হয়। যৌতুক প্রথা চলমান রয়েছে। বহুবিবাহ পূর্বে ছিল না, বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে। ছেলেরা উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্পদের অংশীদার হোন।

কড়া সমাজে 'কড়া ভাষা' প্রচলিত থাকলেও কোন বর্ণমালা নেই। বর্তমানে তারা বাংলা ভাষায় কথা বলে। তাদের পূর্বপুরুষের ধারা অব্যাহত রেখে এখনও কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থকে। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল না হওয়ায় নিজেদের পালিত শুকর, শামুক, ঝিনুক খাওয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে। সপ্তাহে একবার হাট-বাজারে গিয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যদি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে।

সদর উপজেলার আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাঃ পরিচয় ও ভূমিকা

ব্রিসিউস বারলা (মৃত)
বয়স: ৭০ বছর
পিতা: নাস যোসেফ বার্লা (মৃত)
মাতা: পাউলীমা লাকড়া (মৃত)
পেশা: কৃষি
লিঙ্গ: পুরুষ
মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর: ৭নং সেক্টর
জাতিসত্তা: ওরাওঁ
ঠিকানা: মির্জাপুর, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর

ব্রিসিউস বারলা কত বছর বয়সে মারা গেছেন তা জানা যায়নি, তবে আনুমানিক ৭০ বছর বয়সে মারা যান। তিনি ২০০৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি মারা গিয়েছেন। তিনি দিনাজপুরের মির্জাপুর এলাকায় আদিবাসী ওরাওঁ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলেন। ব্রিসিউস বারলার তিন মেয়ে। বড় মেয়ে এলিয় নোরা বারলা (নোবেল), ন্যান্সী মেরী বারলা (ক্লারা) এবং জেন্সী ফিলোমিনা বারলা (শিউলী)। বড় মেয়ে মায়ের অসুস্থতার জন্য বর্তমানে চাকুরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে মায়ের দেখাশুনা করছেন। মেজো মেয়ে সরকারি স্কুলের সহকারি শিক্ষিকা এবং ছোট মেয়ে বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করেছে কিন্তু মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকায় কোন চাকুরি করতে পারছেন না। তার তিন মেয়ে শিক্ষিত।

ব্রিসিউস বারলা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এই তথ্য ছাড়া তার পরিবারের কোন সদস্য তার মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া ও ঘটনা সর্ম্পকে কিছু বলতে পারেনি। তবে গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত উত্তরবঙ্গের আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা (প্রথম ভাগ) বই থেকে তাঁর সর্ম্পকে জানা যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ভারতের পানিহাটায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি শিলিগুঁড়িতে কয়েক মাস ছিলেন। তিনি ৭নং সেক্টরে কর্ণেল নুরুজ্জামানের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধে যাবার জন্য জনাব জর্জ উনাকে অনুপ্রেরণা দেন। তিনি কোন কোন এলাকায় হামলা করেছিলেন তা জানা যায়নি। তাঁর মোট ১২ শতক বসতবাড়ির জায়গা আছে; যা বর্তমানে 'এনিমি প্রোপার্টি' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

ব্রিসিউস বারলা জীবিত থাকাকালীন সময়ে সরকারের দেওয়া সুযোগ সুবিধা (মুক্তিযোদ্ধা ভাতা) পেতেন। তিনি মারা যাওয়ার পর বর্তমানে তার স্ত্রী সেই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন।

গণেশ চন্দ্র রায় (মৃত)
বয়স: ৬৯ বছর
পিতা: লালঝি রবিদাস (মৃত)
মাতা: গহিনি দাস (মৃত)
যুদ্ধের সময় পেশা: দিনমজুর
লিঙ্গ: পুরুষ
শিক্ষগত যোগ্যতা: ৩য় শ্রেণি
মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর: মনে নেই
জাতিসত্তা: রবিদাস
ঠিকানা: যোগীবাড়ি, চেরাডাঙ্গী, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর

গণেশ চন্দ্র রায় ৬৯ বছর বয়সে মারা গেছেন। বাবার নাম লালঝি রবিদাস, মায়ের নাম গহিনি দাস। তার দুই ভাই- পরিচ্ছন্ন রবিদাস ও ধরিচ্ছন্ন রবিদাস এবং তিন বোন- বুধিয়া রবিদাস, আকলিমা রবিদাস ও লকপতিয়া রবিদাস। তার স্ত্রীর নাম শ্রীমতি সরস্বতী রবিদাস। তাদের এক ছেলে- রতন রবিদাস ও তিন মেয়ে- মাধবী রবিদাস, মৌসুমী রবিদাস ও শিল্পী রবিদাস। ছেলে রতনের স্ত্রী সোনামনি রবিদাস এবং তাদের ছেলে সঞ্জয় রবিদাস ও মেয়ে সঞ্চিতা রবিদাস। যুদ্ধের আগে এবং যুদ্ধের পরবর্তীতে তিনি শ্রমিক হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতেন। যুদ্ধের আগে তাদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় ছিল। বর্তমানে তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা পূর্বের থেকে ভালো। তিনি তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তিনি ভারতের হামজাপুর এলাকায় শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভারতের প্রাণসাগর, হামজাপুর এলাকায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি সেক্টর কমান্ডার আশরাফ সিদ্দিকীর অধীনে যুদ্ধ করেন। হামজাপুর বেসিক স্কুল থেকে ঘুঘুডাঙ্গা, কামদেবপুর ও খানপুর এলাকার আশেপাশে মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন মিশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরিবার, গ্রাম ও দেশের মানুষকে রক্ষার জন্য তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাঁচজন পাকিস্তানি সেনাকে রাইফেল দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলেন। রাইফেল নিয়ে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বাঙালি ও আদিবাসী মিলে তিনি সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন মাহাতাব উদ্দিন, আলীমদ্দিন, মনসুর আলী, সাবের আলী, ইসমাইল ও সবুর।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে তিনি-সহ বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতার সুখ অনুভব করলেও ভিটেমাটিতে ফিরে এসে দেখেন ঘর-বাড়ির ভাঙচুর ও বিচ্ছিন্ন অবস্থা। দেশ স্বাধীনের পর তিনি মুক্তিযোদ্ধা সনদ পান। বর্তমানে তার সার্টিফিকেট আছে, লাল মুক্তিবার্তা আছে। তার পরিবার ভাতা পেয়েছিল কিন্তু প্রায় সাত বছর থেকে তার ভাতা বন্ধ আছে। তার পরিবার অফিসে যোগাযোগ করে জানতে পারে গেজেটে তার নাম নেই। বর্তমানে তার পরিবার হতাশায় দিন যাপন করছে।

ইসাহাক সরেন (মৃত)
বয়স: ৫৯ বছর
পিতা: কারমা সরেন (মৃত)
মাতা: আরশু টুডু (মৃত)
পেশা: কৃষি
লিঙ্গ: পুরুষ
মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর: ৭নং সেক্টর
শিক্ষাগত যোগ্যতা: চতুর্থ শ্রেণি
জাতিসত্তা: সাঁওতাল
ঠিকানা: কসবা, পুলহাট, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর

ইসাহাক সরেন ৫৯ বছর বয়সে মারা যান। তিনি দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার ফরিদপুরে এক সাঁওতাল কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি পরিবার নিয়ে দিনাজপুরের কসবা শান্তিপাড়ায় বসবাস করতেন। তার স্ত্রী মার্গারীতা হাঁসদা। তাদের দুই ছেলে- মাথিয়াস সরেন ও মিল্কি সাদেক সরেন এবং ছয় মেয়ে- মার্থা সরেন, হেলেনা সরেন, মার্তিনা সরেন, মিনতি সরেন, শান্তি সরেন ও সরলা সরেন। যুদ্ধের আগে আর্থিক অবস্থা খুব ভালো ছিল না। বর্তমানে তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা পূর্বের চেয়ে ভালো। তিনি চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলেন। তিনি পল্লীশ্রীতে কাজ করতেন।

ইসাহাক সরেনের পরিবারের মারফতে জানা যায় যে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে ১-২ মাস অবস্থান করে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন এবং তিনি ৭নং সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন। তিনি কোন কমান্ডারের অধীনে যুদ্ধ করেছিলেন এবং কোন কোন এলাকায় হামলা চালিয়েছিলেন সেটা তাঁর পরিবারের কেউ বলতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় খ্রিষ্টান মিশনারীরা আদিবাসীদের আশ্রয় দিয়েছিল এবং খাদ্য সরবরাহ করতো। ফাদার লুকাশ মারান্ডী একজন ধর্মযাজক যিনি রুহিয়া ঠাকুরগাঁও এলাকায় ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় শহিদ হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় আদিবাসীদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে এবং গবাদি পশু মেরে ফেলা

হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আদিবাসীরা যখন ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসে তখন দেখে যে, লোকজন তাদের অনেক জমি অন্যায়ভাবে দখল করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি ও আদিবাসীরা একসাথে যুদ্ধ করেছে বলে ইসাহাক সরেন পরিবারের সদস্যদের কাছে গল্প করতেন।

ইসাহাক সরেন জীবিতকালে সরকারের দেওয়া সুযোগ-সুবিধা পেতেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর নামের বানান ভুলের কারণে তার ছেলেমেয়ে সরকারের কোন সুযোগ সুবিধা পায় না। ইসাহাক সরেনের ছেলে-মেয়েরা বলেন, যেহেতু দেশ স্বাধীন করার জন্য তাদের বাবা যুদ্ধ করেছিলেন, তাই তাদেরকে সরকারের সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত।

জুলিয়াস হাঁসদা (মৃত)

বয়স: ৫৫ বছর
পিতা: আলফ্রেড হাঁসদা (মৃত)
মাতা: মারিয়াম টুডু (মৃত)
পেশা: কৃষি
লিঙ্গ: পুরুষ
মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর: ৭নং সেক্টর
শিক্ষাগত যোগ্যতা: তৃতীয় শ্রেণি
জাতিসত্তা: সাঁওতাল
ঠিকানা: মির্জাপুর, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর

জুলিয়াস হাঁসদা দিনাজপুরের মির্জাপুর গ্রামে নিজ বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তার পরিবার মির্জাপুর গ্রামেই বসবাস করছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি লোকমুখে যুদ্ধ শুরু হওয়ার কথা জেনেছেন। মি. জর্জ-এর অনুপ্রেরণায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য মনঃস্থির করেন এবং পরবর্তীতে পরিবারের সাথে কথা বলে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার অধিকাংশ-দিন কেটেছে ভারতের শিলিগুঁড়িতে। জুলিয়াস হাঁসদা ভারতে পানিঘাটায় যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন এবং এক মাস শিলিগুঁড়িতে ছিলেন। এরপর তিনি কর্ণেল কাজী নুরুজ্জামানের নেতৃত্বে ৭নং সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন।

যুদ্ধের সময় আদিবাসীরা অনেক সম্পদ হারিয়েছেন। যেমন: জমিজমা, গরু-ছাগল, ধান ইত্যাদি। যুদ্ধের সময় তাদের এলাকায় আদিবাসী ও বাঙ্গালিদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো ছিল তবে কিছুকিছু স্থানে খারাপ ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি সম্মুখ যুদ্ধে নিজে অংশ নিয়েছেন এবং নিজের দলের সাথীদের মর্মান্তিক মৃত্যু দেখেছেন,

যা ছিল সবচেয়ে করুণ ও বেদনাদায়ক। দেশের স্বাধীনতাই তাকে সবচেয়ে বেশী আনন্দ দিয়েছিল।

যুদ্ধের সময় জুলিয়াসের পরিবার পরিজনেরা ভারতের শিববাড়ীতে ছিলেন। যুদ্ধের সময় খ্রিষ্টান মিশনারীরা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে সহযোগিতা করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় মানুষের খাওয়া-দাওয়া ছিল না বললেই চলে। কোনোমতে মানুষ খেয়ে বেঁচেছিল। পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম অত্যাচার এবং নৃশংস আক্রমণ কোনোভাবেই ভুলে যাওয়ার নয়। পরিবারের কাছে তিনি বলেন, যুদ্ধের সময় তিনি মোহনপুর, ফুলবাড়ি, নবাবগঞ্জ ও বগুড়ায় বেশি সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তার নাম নিবন্ধন হয়েছে ০৩০৮০১০৪০১৯ মুক্তিযোদ্ধা নং ১২০০। তার পরিবার বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সরকারি ভাতা গ্রহণ করছেন এবং তার কথা পত্রিকাতেও উঠেছে। তিনি সরকারের কাছে জমির জন্য এবং তার সন্তানেরা যেনো পড়াশুনা ও চাকুরির সুযোগ-সুবিধা পায় সেই জন্যেও আবেদন করতে চেয়েছিলেন। আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের ইতিহাস বই আকারে লেখা হোক এটাও জুলিয়াস হাঁসদার এক অনন্য ইচ্ছা ছিল, যাতে করে দেশের সকল মানুষ তাদের বীরত্বের কথা জানতে পারে।

১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে জুলিয়াস হাঁসদা মারিয়া কিস্কুকে বিয়ে করেন। তাঁদের দুই সন্তান। মেয়ে এমেলিনা হাঁসদা, সুইহারী ধর্মপল্লী দিনাজপুর থেকে দর্জির প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং ছেলে বিপ্লব হাঁসদা কারিতাস ট্রেড স্কুলে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। জুলিয়াস হাঁসদা'র বসতভিটা ৯ শতক জমি আছে যা 'এনিমি প্রোপার্টি' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে এবং আবাদি কোন জমি নাই। তিনি ২০১০ সালে মারা যান। মৃত্যুর পর তার স্ত্রী মরিয়ম কিস্কু ভাতা গ্রহণ করছেন। ছেলে বিপ্লব হাঁসদার শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকায় সরকারি চাকুরির জন্য যোগাযোগ করেনি। ভাতা পেয়ে তার পবিবারর এখন ভালো আছে।

লক্ষণ মার্ডী (মৃত)

বয়স: ৭০
পিতা: ডায়লা মার্ডী (মৃত)
মাতা: কান্দিনি কিস্কু (মৃত)
যুদ্ধের সময় পেশা : দিনমজুর
লিঙ্গ: পুরুষ
মুক্তিযুদ্ধের সময়কালী সেক্টর: মনে নেই
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বাক্ষর জ্ঞান
জাতিসত্তা: সাঁওতাল

বর্তমান ঠিকানা: গ্রাম- তালপুকুর, পোস্ট- শিকদার, থানা- কোতয়ালি, জেলা- দিনাজপুর

লক্ষণ মার্ডী ৭০ বছর বয়সে মারা গেছেন। বাবার নাম ডায়লা মার্ডী, মায়ের নাম কান্দিনি কিস্কু। তার দুই ভাই চরণ মার্ডী ও বাবুলাল মার্ডী। একজন বোন লক্ষী মার্ডী। স্ত্রী ধানী মুরমু। তাদের দুই ছেলে- সুশীল মার্ডী ও বিপ্লব মার্ডী এবং এক মেয়ে- পিংকি মার্ডী। ছেলে সুশীল মার্ডী ও স্ত্রীর নাম সকিনা কিস্কু। তাদের দুই ছেলে সামুয়েল মার্ডী, রাফায়েল মার্ডী ও মেয়ে লিজা মার্ডী। ছেলে বিপ্লব মার্ডীর স্ত্রীর নাম সোনালি মুরমু। তাদের ছেলে আন্তনী মার্ডী ও মেয়ে অনন্যা মার্ডী।

যুদ্ধের আগে ও যুদ্ধের পরবর্তীতে তিনি দিনমজুর হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতেন। যুদ্ধের আগে তার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল। বর্তমানে তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো না। ৭ মার্চের ভাষণ শোনার পর তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। আশেপাশে নিরীহ মানুষের হাহাকার, আর্তনাদ, চিৎকার তাকে বিচলিত করে তুলেছিল। মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা ছিল তার। দেশকে শত্রু মুক্ত করতে হবে, স্বাধীন করতে হবে। নইলে থামবে না এই আর্তনাদ, সব শেষ হয়ে যাবে। সবাই মারা পড়বে। আদিবাসী হয়ে এমন চিন্তা-চেতনা থেকে তিনি যুদ্ধে যান।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি কুঠিবাড়ি ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেশী অস্ত্র তীর-ধনুক ও লাঠি নিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ভারতের হামজাপুর এলাকায় প্রশিক্ষণ শেষে সেক্টন কমান্ডার আশরাফ সিদ্দিকির অধীনে যুদ্ধ করেন। হামজাপুর থেকে রাণীপুকুর, সৈয়দপুর, পুনর্ভবা নদীর পাড়, কুঠিবাড়ি ও আশেপাশে মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন মিশনে অংশগ্রহণ কারেছেলেন। নিজের পরিবার, গ্রাম ও দেশের মানুষকে রক্ষার জন্য তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

যুদ্ধ চলাকালীন তিনি ও তার দল-সহ চারজন পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করেন। বাঙালি ও আদিবাসী মিলে একই সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বাঙালি যোদ্ধাদের মধ্যে রফিকুল ইসলাম নামে তার একজন প্রিয় সঙ্গী ছিল। বিপদে-আপদে রফিকুল ইসলাম তাকে অনেক সহযোগিতা করেছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে তিনি ও বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা দেশে ফিরে আসেন। তালপুকুর গ্রামের নিজ বাড়িতে এসে দেখেন তাদের বাড়ি ঘরের অবস্থা করুন। সবকিছু লুটপাট ও ভাঙচুর হয়ে গেছে। যুদ্ধ জয় করে বাড়ি ফিরে এসে তিনি ও তার সঙ্গীরা স্বাধীনতার সুখ গ্রহণ করে কিন্তু কয়েকদিন পরে অসুখে তার শ্বশুর ও শাশুড়ী মারা যান।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি মুক্তিযুদ্ধ সনদ পেয়েছিলেন। কিন্তু অন্য লোকের কুপরামর্শে ও মিথ্যা ভয়ভীতিতে কাগজপত্র জমা দেননি। তাকে বলা হয়েছিল যে

তুমি আদিবাসী মানুষ, সেখানে গেলে তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলবে। তাই সে মুক্তিযুদ্ধের সনদপত্র জমা দিতে পারেননি।

বর্তমানে তার মুক্তিযোদ্ধার গেজেটে নাম নেই। মুক্তিযোদ্ধার সনদ পত্রটি তার পরিবার হারিয়ে ফেলেছে। ফলে পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধাদের দেওয়া সরকারি সুযোগ সুবিধা তিনি নিতে পারেননি। কী করতে হবে সেটা বুঝতে পারেননি বলে সার্টিফিকেট উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে তার পরিবার হতাশায় জীবনযাপন করছে। এই তথ্য পরিবার থেকে সংগৃহীত।

নরেশ সরকার মুর্মু
বয়স: ৬৬ বছর
মাতা: মারাং দাই
পিতা: মঙ্গল মুর্মু
পেশা: দিনমজুর (আদিবাসী বিয়েবাড়িতে বাদ্য বাজান)
লিঙ্গ: পুরুষ
মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর: ৭নং সেক্টর
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাশ করতে পারেননি।
জাতিসত্তা: সাঁওতাল
ঠিকানা: খোসালপুর, ২ নং সুন্দরবন, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর

নরেশ সরকার মুর্মু ৭ মার্চের ভাষণ শুনে যুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি নিরীহ বাঙালির উপর নির্যাতনের কথা শুনে বিচলিত হয়ে ওঠেন। সিদ্ধান্ত নেন দেশকে শত্রুমুক্ত করবেন। প্রাণ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ লড়াই করবেন, তবুও স্বাধীন করবেন। তার এই আত্মমনোবল সত্যি সত্যি শত্রুমুক্ত করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে।

যুদ্ধের সময় তিনি অস্ত্রচালনার ট্রেনিং নিয়েছিলেন মতিউর রহমানের কাছ থেকে। তার একমাত্র বোন রূপামনি। যুদ্ধের সময় তিনি পঞ্চম শ্রেণিতে পড়তেন। তিনি হবি চেয়ারম্যান, জহুর ফাতরা, শহিদ কেতাব মাষ্টার-সহ অন্যান্যদের নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি পরিবার-সহ ভারতের ফতেহপুর গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি চম্পাতলি, সৈয়দপুর ও ব্যাংকালী এলাকায় মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন মিশনে অংশগ্রহন করেছিলেন। তিনি ভারতের ফতেহপুর ক্যাম্পে ছিলেন। তিনি ডালিমগাঁও, জামালপুর, মোহনপুর ও দশমাইলে আক্রমন চালিয়েছেন। দেশকে রক্ষা করার জন্য পাকিস্তানিদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধের সময় নিজেই তিনি পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়েছিলেন তিনি ভাবছিলেন তিনি হয়ত আর বাঁচবেনা পরে ভারতের এক হড় (সান্তাল) মুনসি নেতা তাকে বাঁচিয়েছিলেন। বাঙালীরা অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ

করলেও তিনি তীর ধনুক দিয়েও যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি বেলবাড়ী এলাকার নিরলা নামের সাঁওতাল নারীকে নির্যাতিত হতে দেখেছেন এবং অনেক মানুষের মৃত্যু দেখেছেন যেটি আজও ভুলতে পারেননি। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার পরিবার নিজের ব্যবহার্য জিনিসপত্র গর্ত করে ঢাকা দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর ফিরে এসে সেসব কিছুই পাননি। সর্বস্ব লুট হয়ে যায়। একটি ঘটনা তাকে বারবার বিচলিত করে। যুদ্ধকালীন সময়ে এক মহিলা তার ছাগলের বাচ্চা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। আতংকে বার বার মহিলাটির হাত থেকে ছাগলের বাচ্চা পড়ে যাচ্ছিল। আবার অবাঙালি (বিহারী) মহিলাকে ধরে এনে পুড়িয়ে মারা হয়। চোখের সামনে একজনকে গুলি করে হত্যা করতে দেখেছেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তিনি কাগজপত্র ঐ দেশে রেখে আসেন। তবে কমান্ডার জীবিত থাকাকালীন কাগজপত্রের জন্য ঢাকা পর্যন্ত যোগাযোগ করেছিলেন এবং তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে নরেশ সরকার মুর্মুর কাগজপত্র ও সার্টিফিকেট না থাকায় কোন সুবিধা তিনি পাচ্ছেন না। সার্টিফিকেটের যে মূল্য আছে তখন তিনি বুঝেননি। যদি বুঝতেন তাহলে হয়তো আজ তিনি ভাতা পেতেন। এই ভাতার আওতায় না আসতে পেরে তিনি মানসিকভাবে মর্মাহত। ভাতা পেলে আজকে পরিবারটি অনেক স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপন করতে পারতো। তারপরও তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। নিজ প্রাণের ভয় না করে অর্জিত স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ, এ গর্বে তিনি আত্মহারা হয়ে ওঠেন।

পাত্রাস হাঁসদা (মৃত)

বয়স: ৬২ বছর
মাতা: মারিয়াম টুডু (মৃত)
পিতা: আলফ্রেড হাঁসদা (মৃত)
পেশা: কৃষি
লিঙ্গ: পুরুষ
মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর: ৭নং সেক্টর
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেট্রিক পাশ
জাতিসত্তা: সাঁওতাল
ঠিকানা: মির্জাপুর, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর

মুক্তিযোদ্ধা জুলিয়াস হাঁসদার বড়ভাই পাত্রাস হাঁসদা নিজেও একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনিও দিনাজপুরের মির্জাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং এ গ্রামেই বসবাস করতেন। পাকিস্তান আমলেই তিনি মেট্রিক পাস করেছেন। সে সময়ে আদিবাসীদের ভেতর মেট্রিক পাস করাটা অনেকখানিই কঠিন ছিল। প্রাতিষ্ঠানিক এই শিক্ষা সমাজে

তাঁর এক আলাদা গুরুত্বও তৈরি করেছিল। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লোকমুখে জানতে পারেন যুদ্ধ শুরু হয়েছে। পরবর্তীতে সে ও তাঁর ছোট ভাই জুলিয়াস হাঁসদা সিদ্ধান্ত নেন যুদ্ধে অংশগ্রহণের। সে সময়ে তখন গ্রামের গ্রামপ্রধানরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তেমন কোনো সামাজিক সিদ্ধান্ত দেয়নি। যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তাদের কোনো চাপ ছিল না। নিজের বিচার বুদ্ধিতেই তারা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বশরীরে অংশ নেন।

পাকিস্তানি হানাদারেরা যখন তখন তাদের গ্রাম আক্রমণ করতো। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সব ছাড়খাড় করে দিত। বীভৎসভাবে তারা গ্রামের নিরীহ মানুষ ও মুক্তিসেনাদের হত্যা করেছে। লুটপাট, নির্যাতন ও ধর্ষণ করেছে। সেইসব নৃশংস করুণ দৃশ্য কোনোদিনও ভোলার নয়। যখন মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প বা কোনো ঘাঁটি আক্রমণ করে বিজয়ী হতো তখন সে দেশ স্বাধীন করার শক্তি ফিরে পেত বারবার। মুক্তিযুদ্ধের সময় আদিবাসী ও বাঙালিদের ভেতর সম্পর্ক ভাল ছিল। পাত্রাস হাঁসদা ভারতের পানিঘাটায় যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। এরপর তিনি কর্নেল কাজী নুরুজ্জামানের নেতৃত্বে ৭নং সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন। তিনি ও তাঁর ভাই জুলিয়াস হাঁসদা মিঃ জর্জ এর অনুপ্রেরণায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তবে তাঁর নাম মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিবন্ধন হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর পরিবার ভারতে আশ্রয় নেয় এবং যেসব পরিবার ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের প্রায় সকলেই দেশ স্বাধীনের পর গ্রামে ফিরে আসে। মুক্তিযুদ্ধের সময় নারী, শিশু ও প্রবীণদের নিয়েই সকল শংকা ছিল। তারা ভাবতেও পারেননি অবুঝ নিরীহ শিশুদের পাকিস্তানি বাহিনীরা থেৎলে মেরে ফেলবে। শিশুদের মৃত্যু চিৎকার তাদেরকে আরও শক্তিশালী করেছিলো। এসব কিছু লোকমুখে শোনা। জীবিত থাকলে হয়তো আরও গোপন ঘটনা জানা যেত।

১৯৬৩ সালে এলিজাবেথ মুরমুর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। পরবর্তীতে তার স্ত্রী এলিজাবেথ মুরমু মারা যান। তাঁদের এক ছেলে দীপক হাঁসদাও মৃত। পাত্রাস হাঁসদার ১২ শতক বসত ভিটা যা 'এনিমি প্রোপার্টি' হিসেবে আছে কিন্তু তার পরিবারের আবাদী কোন জমি নাই। জীবিত থাকাকালীন তিনি সরকারের কাছে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে চাষাবাদের জন্য কিছু জমির আবেদন করেছিলেন। যুদ্ধের সময় অনেক আদিবাসী লোকজন তাদের ভূমি হারিয়েছে, সরকার যেন আইনগতভাবে আদিবাসীদের সেসব জমি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। পাশাপাশি দেশের সকল আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধার নাম নিবন্ধনের প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি ১৯৮২ সালে মারা যান। প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে তিনি নিবন্ধিত হন এবং তার ছেলে দিপক হাঁসদা জীবিত থাকাকালীন দুই বছর ভাতা পেয়েছিলেন। দিপক হাঁসদা মারা যাবার পর তাঁর দুই বোন আন্তনিয়াতা হাঁসদা ও রেজিনা হাঁসদা ভাতা পাচ্ছেন। আন্তনিয়াতা হাঁসদা বগুড়ায় স্বামীর বাসায় থাকেন এবং বোন রেজিনা

হাঁসদা প্যারালাইসিস হয়ে বিছানায় শয্যাশায়ী। বর্তমানে রেজিনা হাঁসদা শয্যাশয়ী হওয়ার কারণে টাকা উঠাতে পারছেনা।

রাবণ কিস্কু
বয়স: ৭৩ বছর
পিতা: মৃত লক্ষণ কিস্কু
মাতা: মৃত সীতা টুডু
পেশা: কৃষি
লিঙ্গ: পুরুষ
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি
মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর: ৭ নং সেক্টর
জাতিসত্তা: সাঁওতাল
ঠিকানা: কসবা মিশনপাড়া, পুলহাট, কোতয়ালী, সদর, দিনাজপুর। বর্তমানে বসবাস করছেন খামার ঝাড়বাড়ী, মহতপাড়া, যমুনারপাড়, ৬নং আউলিয়াপুর, সদার, দিনাজপুর।

রাবণ কিস্কু দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার উত্তর লক্ষ্মীপুর গ্রামের চিলহা পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি দিনাজপুর সদর উপজেলার ৬নং আউলিয়াপুর ইউনিয়নের ঝাড়বাড়ী, মহতপাড়া, যমুনারপাড় খাস জমিতে পরিবার সহ বসবাস করছেন। তিনি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন এবং মাঝে মাঝে অটো চালান। তিনি আদিবাসী সাওঁতাল সম্প্রদায়ের এবং খ্রিস্টান ধর্মালম্বী। তিনি যখন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন তখন তার নাম হয় ভিনসেন্ট কিস্কু। তাঁর নামের জটিলতার কারণে ও ছেলে মেয়েদের শিক্ষাগত সনদপত্রে রাবণ কিস্কু নাম না থাকায় কিছু জটিলতা তৈরি হয়েছে। যা তারা এখন নোটারি পাবলিক করে সমাধানের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তার সাথে ১৯৮০ সালে বার্থলো টুডুর বিয়ে হয়। তাদের দুই ছেলে সাগর কিস্কু, (এসএসসি ফেল, বিবাহিত), পিতর কিস্কু (এইচএসসি পাস) ঢাকায় কোম্পানিতে কর্মরত ও দুই মেয়ে পারভীন কিস্কু (এসএসসি পাস) বিবাহিত, পারুল কিস্কু (এসএসসি পাস) ঢাকায় কোম্পানিতে কর্মরত।

যুদ্ধের সময় তার বয়স একুশ বছর। পাকিস্তান সেনাদের অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় তার ভেতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ রেড়িওতে শুনেন। তাঁরই আহবানে সাড়া দিয়ে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। বাঙালি না হয়েও বাঙালিদের ওপর বর্বরতার দৃশ্য তাকে ঘরে থাকতে দেয়নি। দেশ ও দেশের মানুষকে রক্ষা করার তাগিদে ভারতের শিলিগুড়ি কাটলা ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন । অস্ত্র

চালনাসহ নানারকমের কলাকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নেন। দীর্ঘ এক মাস প্রশিক্ষণ শেষ করে ৭ নং সেক্টরে কর্ণেল কাজী নূরুজ্জামানের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেন। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর, হিলি, রানীনগর, বিরামপুর, ফুলবাড়ী, পার্বতীপুর, জয়পুরহাট, পাঁচবিবি, প্রভৃতি জেলা উপজেলায় মিশন পরিচালনা করেন। এ সময় কমান্ডার তোজ্জাম্মেল হক এর নেতৃত্বে মিশন পরিচালনা করেছিলেন। গেরিলা বাহিনীর সাথেও তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। ছদ্মবেশে মাঠে কাজ করার কৌশলে পাকিস্তানি সেনাদের একজনকে গুলি করে হত্যা করেন। যুদ্ধরত অবস্থায় মাদিলা বনতাড়া এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে আহত করেন এবং দশ জন পাকিস্তানি নিহত হয়। বাঙালি ও আদিবাসী মিলে একত্রিত হয়ে যুদ্ধে করেন। তাদের মধ্যে বিশু সরেন, জনাব মইনুদিন, জামাল, রাজকুমার, ইসাহাক, মঙ্গল টুডু, ধনু মুর্মু আরও অনেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে নিজ বাড়িতে ফিরে এসে দেখে বাড়িঘর কিছুই নেই। পরে পরিবারের সাথে দেখা হয়। স্বাধীনতার সূর্য এই আদিবাসী সন্তানেরা বিনা স্বার্থে ছিনিয়ে আনেন। স্বাধীন লাল সবুজের পতাকা যখন উড়তে থাকে তখন তার বুক গর্বে ফুলে ওঠে।

বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে পেরেছিল বলে নিজেকে পরাধীনতার হাত থেকে রক্ষা করেছে। দেশের বাঙালি অবাঙালি আদিবাসী আজ একই স্বাধীন নামক ছাতায় বসবাসরত। যুদ্ধকালীন সময়ে নিজ মনোবল ও আত্মশক্তি প্রখর হওয়াতে শত্রুদের মোকাবেলা করতে সাহস পেয়েছিলেন। তারপরও কিছু কিছু ঘটনা মনকে তাড়া করে বেড়ায়। চোখের সামনে পরিবার পরিজনকে ছেড়ে যুদ্ধে আসা আর বাঙালি বন্ধুদের নির্মম হত্যা তাকে বিচলিত করে আজও। হাত পা বেঁধে গুলি করার দৃশ্য তার হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি করেছে। তিনি গর্বিত একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। তার এফ এফ নং ৪৩০৩, মুক্তিবার্তা নং ০৩০৮০১০০৪৩। সেক্টর নং ৩৯৬, মন্ত্রনালয় সাময়িক সনদপত্র নং ৯৮৭০১।
পরবর্তী প্রজন্ম যেন তাদেরকে ভুলে না যায় এই প্রত্যাশা তার ।

রবিন সরেন

বয়স: ৮৭
মাতা: লখিয় হাঁসদা (মৃত)
পিতা: জেঠু সরেন (মৃত)
বর্তমান পেশা: কৃষিকাজ
লিঙ্গ: পুরুষ
মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর: ৭ নং
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রথম শ্রেণি

জাতিসত্তা: সাঁওতাল
ঠিকানা: পারগাঁও লালদিঘী, ৩ নং ফাজিলপুর ইউনিয়ন, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর

দিনাজপুরের পারগাঁও এলাকায় এক সাঁওতাল কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন রবিন সরেন। প্রথম শ্রেণিতে পড়ার পর আর পড়াশুনা করতে পারেননি তিনি। পেশাতে তিনি সফল একজন কৃষিজীবী। জাতিতে সাঁওতাল এবং সনাতন সাঁওতাল ধর্মাবলম্বী। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি বাংলাদেশেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন এবং ভারতের গোপালগঞ্জে ১০ দিন ছিলেন। তিনি লেঃ মতিয়ার রহমানের নেতৃত্বে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রবিন সরেন ই.পি.আর হিসেবে কাজ করতেন আর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের কিছু উল্লেখযোগ্য স্মৃতির রেশ টেনে তিনি জানান, মাহবুবুর নামে তার এক বাঙালি বন্ধু ছিলেন। যুদ্ধের সময় তারা একই সঙ্গে ছিলেন। সেসময় তারা রংপুরের তিস্তা এলাকায় জঙ্গলের মধ্যে ক্যাম্প করে ছিলেন। হঠাৎ খান মিলিটারিরা সকালে একদিন ক্যাম্পে আক্রমন চালায়। সে সময় খানদের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে রবিন সরেনের বন্ধু মাহাবুবর পড়ে যায় আর বারবার বলতে থাকে দলের সবলোকজন যেন তাকে ছেড়ে চলে যায়, তার জন্য কোন চিন্তা না করে। মাহাবুবর রহমান আরও বলেন যে, এই অবস্থায় তাকে যেন সাথীরা নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত না হয়, কারন তাদের এই দেশকে স্বাধীন করতে হবে। গুলিতে আহত রক্তাক্ত মাহাবুবুর রহমানকে বাঙালি সহযোদ্ধা মুক্তিসেনারা ছেড়ে চলে গেলেও রবিন সরেন তাকে ছেড়ে যাননি। কিন্তু মাহাবুবকে সারারাত চেষ্টা করেও বাঁচানো যায়নি। রবিন সরেনকেও চলে আসতে হয়। পরদিন গিয়ে দেখেন মাহবুবর রহমানের লাশ শিয়াল কুকুরেরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে খেয়েছে। তাকে আর দাফন করা যায়নি। নিজের চোখের সামনে সহযোদ্ধার নির্মম মৃত্যু তাকে এখনও কাঁদায়। রবিন সরেন জানান, মুক্তিযুদ্ধের সময় আদিবাসীরা ভারতে চলে যাবার পর তারা সবচেয়ে বেশী জমি হারায়। এছাড়া যুদ্ধের সময় জোর জুলুম করে অনেক বাঙালি নিরীহ আদিবাসীদের জমি কেড়ে নেয়। রবিন সরেন দুঃখ করে বলেন, অনেক বাঙালি মুসলিমরা বাংলাদেশকে মুসলমানের দেশ আর ভারতকে হিন্দুর দেশ বলে ভাগ করতো। তারা আদিবাসীদেরকেও হিন্দু মনে করতো। তারা ভয় দেখিয়ে বলতো, ভারত চলে যাও। মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থী হয়ে ভারতে চলে যাওয়া অনেক পরিবার আর ভয়ে দেশে ফিরে আসেনি। বাঙালি ও আদিবাসীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের আগে সম্পর্ক কিছু ভালো থাকলেও পরবর্তীতে সম্পর্কগুলো জটিল হতে থাকে বলে জানান রবিন সরেন।

মুক্তিযোদ্ধা রবিন সরেনের নিজেরই পাঁচ বিঘা জমি যা বর্তমানে এলাকার প্রভাবশালী বাঙালি হিন্দুরা জবর দখল করে ভোগ করছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় আদিবাসী ও বাঙালিদের সম্পর্ক খুব ভালো ছিল বলে রবিন সরেন জানান। তবে

যুদ্ধের আগেও আদিবাসী ও বাঙালিদের সম্পর্ক ভালো ছিল। কারণ তখন কোন আদিবাসীর জমি হরণ হয়নি এবং কোন আদিবাসী মেয়ে তার বাবার সামনে ধর্ষিত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী দ্বারা এবং দেশ স্বাধীনের পর স্বাধীন বাঙালিদের দ্বারা এসব ঘটনা নানা সময়ে ঘটেই চলেছে। রবিন সরেনের ভাষ্য, যুদ্ধের পর দেখা গেছে আদিবাসীদের জমি জায়গা জুলুম করে বাঙালিরা ভোগ করছে। এখন আদিবাসীদের কোন নিরাপত্তা নেই।

রবিন সরেন জানান, মুক্তিযুদ্ধের সময় তার জানা মতে ঘোড়াঘাট, নবাবগঞ্জ এবং বিরামপুরের আদিবাসী সাঁওতালরা বাঙালিদের পর সবচেয়ে বেশী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। রবিন সরেন জানান, সবসময়ই সাঁওতাল সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয় এক সুশৃঙ্খল মানঝি পরিষদ নামের এক সামাজিক কাঠামো দ্বারা। মুক্তিযুদ্ধের সময় আদিবাসী গ্রাম পঞ্চায়েত বা মানঝি হাড়াম ও আদিবাসী নেতারা সিদ্ধান্ত নেন যুদ্ধ করার। এক্ষেত্রে তারা তীর ধনুক নিয়ে রাতের আঁধারে ওত পেতে থাকতেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে মোকাবেলা করার জন্য। আদিবাসীদের কাছ থেকেই বাঙালি মুক্তিসেনারা তীর ধনুকের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তবে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য কেউ কাউকে জোর করেনি। নিজের দেশকে স্বাধীন করার জন্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলে ঝাপিয়ে পড়েছিল।

রবিন সরেন জানান, লুথ্র হাঁসদা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় আদিবাসীদের নেতৃত্বদানকারী অন্যতম সংগঠক। তিনি সাকরাম মাঝির নাম শুনেননি। মুক্তিযুদ্ধের সময় রবিন সরেনের দেখা সবচেয়ে করুণ ও দুঃখের ঘটনা বর্ণনাকালে জানান যুদ্ধ চলাকালীন একবার কুড়িগ্রামের এক সীমান্ত এলাকার এক গ্রামের জঙ্গলে রবিন সরেনসহ মোট ২৭৫ জন মুক্তিযোদ্ধা ঘাটি স্থাপন করেন। সেখান থেকে এক রাত্রে তারা খানসেনাদের এক ঘাটিতে অপারেশন চালাতে গেলে মুক্তিসেনাদের এক সহযোগি গুলিবিদ্ধ হয় এবং চিৎকার করে বলতে থাকে তাকে সাথে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু সাথীরা কেউ তাকে সাথে নিয়ে আসতে পারেনি। ঘটনাটি আজও রবিন সরেনকে পীড়া দেয়। আরও খারাপ লেগেছে সবচেয়ে বেশি যখন মা বোনদের উলঙ্গ করে খানরা ভ্যানে করে নিয়ে যেত। কষ্ট লেগেছে খুবই যখন জীবন্ত শিশুদের আগুনে ফেলে দেওয়া হতো।

রবিন সরেন বেশ কিছু সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন। কুড়িগ্রামের পশ্চিম তিস্তা ঘেষে এক গ্রামে একদিন বিকেল পাঁচটায় তারা ২৭৫ জন মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল পাকিস্তানি সৈন্যদের ঘাটিতে আক্রমণ করে ভারি অস্ত্র নিয়ে আসতে সক্ষম হন। সেদিন তাদের খুব আনন্দ লেগেছিল। যুদ্ধের সময় তাদের পরিবার পরিজন সকলে ভারতে ছিল। তাদের কোন খোঁজখবর পাওয়া যেত না। রবিন সরেন পার্বতীপুরে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন। সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ১৬০ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। রবিন সরেন জানান, মুক্তিযুদ্ধের পরপর বছর পাঁচেক তিনি সরকারি সাহায্য সহযোগিতা

হিসেবে চাল ডাল শীতবস্ত্র পেয়েছেন। তবে এখন কিছু পান না। তার মুক্তিযোদ্ধা নিবন্ধনের নম্বর ছিল কিন্তু সব কাগজপত্র হারিয়ে গেছে। তিনি এখন চান যেন তার নাম মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আবার তালিকাভুক্ত করা হোক এবং একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রাষ্ট্রের সেবাগুলো তার জন্য বরাদ্দ করা হোক। বিশেষকরে ভূমিদস্যুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একজন আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি চান সরকারের কাছে উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের জন্য নিরাপত্তা দাবী করেছেন।

রবিন সরেনের ৩০ শতক বসতভিটা আছে এবং ৯৬ শতক আবাদী জমি আছে। ১৯৮০ সালে তিনি বাহামনি বাস্কের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের মেয়েদের নাম হচেছ মনি সরেন, ধানী সরেন, মুন্নী সরেন, মিনতী সরেন ও ছেলে মিঠুন সরেন। সকলে বিবাহিত। মিঠুন সরেনের স্ত্রীর নাম সুমিত্রা হেমব্রম, তাদের ২ ছেলে নাম মহেশ সরেন ও সমেশ সরেন।

সুকু সরেন (মৃত)
বয়স: ৭১ বছর। যুদ্ধের সময় বয়স ছিল ২৫ বছর।
পিতা: বগই সরেন (মৃত)
মাতা: মুনি মুর্মু (মৃত)
পেশা: আদি জমি চাষাবাদ করতো
লিঙ্গ: পুরুষ
মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর: ০৭ নং
শিক্ষাগত যোগ্যতা: তৃতীয় শ্রেণি
জাতিসত্তা: সাঁওতাল
ঠিকানা: পারগাঁও, রাণীগঞ্জ, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর

সুকু সরেন যখন ছোট ছিলেন তখন তার বাবা মারা যান। মা ও দাদীর কাছে বড় হন তিনি। তার এক বোন ছিল তার নাম মুংলী সরেন। কোন ভাই ছিল না। যুদ্ধের আগে তিনি বাহাফুল হেমব্রমকে বিয়ে করেন। তাদের দুই ছেলে দুই মেয়ে বর্তমান রয়েছে। প্রথম ছেলে যীশু সরেন বিবাহিত স্ত্রীর নাম সনতি মার্ডী তাদের দুই ছেলে। স্বপ্ন সরেন ও তপন সরেন । মেয়ে সুমিত্রা সরেন। দ্বিতীয় ছেলে নিকোলাস সরেন বিয়ে করেছেন এবং তার স্ত্রীর নাম মারিয়া গরেট্টী কিস্কু।

যুদ্ধের আগে তিনি আধি জমি চাষাবাদ করতেন। তখন তার পরিবার মোটামুটি ভাল চলতো । যুদ্ধের আগে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করলেও নানা প্রতিকুলতার কারনে লেখাপড়া চালাতে পারেননি। তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া জানলেও রাজনীতি সম্পর্কে তার আগ্রহ সেসময় থেকেই ছিল। দেশের পরিস্থিতির খবরাখবর সবসময় রাখত। বাঙালী মানুষের ওপর এমন নির্মম অত্যাচারের কথা

শুনে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যুদ্ধে যাওয়ার। তখন তিনি ভারতে গিয়ে সাফানগরে ছিলেন। সেখানে থাকাকালীন সময়ে মুক্তিযুদ্ধ প্রশিক্ষন ক্যাম্পে গিয়ে যুদ্ধের কৌশল শিখেন এবং বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বাঙালী মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে নিয়ে মিশনে যান।

মা ও দাদী যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে চিন্তায় পড়ে যান এবং নাতির খোঁজ করতে থাকেন। পনের দিন পর তিনি পরিবারের কাছে শরর্নাথী শিবিরে আসেন। মা ও দাদী তাকে আর মিশনে যেতে দেননি। স্ত্রীর কাছ থেকে জানা যায়, মা ও দাদী কথা রাখার জন্য আর যুদ্ধে তার যাওয়া হয়নি। তবে সে তার বাঙালী বন্ধুদের নানাভাবে যুদ্ধের সময় সাহায্য করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহন করে ছিলেন, কাগজ পত্র ছিল, পোষাক ছিল, যুদ্ধের বিভিন্ন নথিপত্রও ছিল, ব্যাজও ছিল। যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করতেন । বিভিন্ন কারণে এই সব নথিপত্র হারিয়ে ফেলেন। যুদ্ধের কথা বাহাফুল হেমব্রম কিছু কিছু মনে আছে। যুদ্ধের পরে সুকু সরেন তার স্ত্রী বাহাফুল হেমব্রমের কাছে যুদ্ধের গল্প করতেন। সুকু সরেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে দেখেন বাঙালী ও আদিবাসী যুবক প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। তাদের দেখে উদ্ধুদ্ধ হয়ে নিজের দেশকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধের ময়দানে নেমেছিলেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নিজ দেশে নিজ গ্রাম পারগাঁও এসে ধ্বংস স্তুপ দেখতে পান। স্ত্রী বাহাফুল হেম্ব্রম কাছ থেকে জানা যায় ঘরের কাঠামো ভাল কাঠ দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। মোটা মোট কোয়ালী কাঠ লুঠ হয়ে গেছে। সুকু সরেন যুদ্ধের এক সময় দেশে এসে গরু ও ধান নিয়ে গিয়েছিলেন ভারতে। তার স্ত্রী এক টোপলা রুপার জিনিস সঙ্গে নিয়ে যায়। মোহনপুর বর্ডার পার হওয়ার সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের উপর গুলি চালায়। অনেকে নদীর ধার দিয়ে দৌড়ে বর্ডার পার করে। স্ত্রী রুপার টোপলাটি আগাছা দিয়ে ঢেকে রক্ষা করে। পরে ভারতে গিয়ে রুপার টোপলাটি চুরি হয়ে যায়। সম্বল বলতে নিজের প্রাণ নিয়ে স্বাধীন হওয়ার পর দেশে ফিরে আসেন।

ফিরে আসার পর অনেক বার সুকু সরেন ঢাকায় যান বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য এবং সরকারি সুযোগ সুবিধা পাবার জন্য। অনেক যোগাযোগ করার পর সরকার থেকে চট্টগ্রামে সরকারি চাকরি করার জন্য ডাক দেওয়া হয় । যোগদানের পনের দিন আগে অসুস্থ্য হয়ে পড়েন এবং পরে আর চাকরিতে যেতে পারেননি । তখন থেকে ঘর সংসারের প্রতি মনোনিবেশ করেন।

তিনি চেয়ে ছিলেন সরকার থেকে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বের করে প্রাপ্যসম্মান প্রদান করে সরকারি সুযোগ সুবিধা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবার গুলোকে সহায়তা দিলে ভাল হতো । কিন্তু তা আর হয়নি । সুকু সরেন ২০১৮ সালে ৭১ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।

সোমেন্দ্র টুডু (মৃত)
বয়স: ৭৫ বছর। মুক্তিযুদ্ধের সময় বয়স ছিল ২৪ বছর
পিতা: মাঝি টুডু (মৃত)
মাতা: সুমি মুর্মু (মৃত)
পেশা: কৃষিকাজ
লিঙ্গ: পুরুষ
মুক্তিযুদ্ধের সময়কালী সেক্টর: ৭ নং
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পঞ্চম শ্রেণি
জাতিসত্তা: সাঁওতাল
বর্তমান ঠিকানা: পারগাঁও, রাণীগঞ্জ, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর

সোমেন্দ্র টুডু মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে কৃষিজীবী ছিলেন। তখন প্রায় তাদের ত্রিশ বিঘার মত জমি ছিলো ও চাষাবাদ করতো। যুদ্ধের ধ্বংসলীলার মধ্যে পড়ে পরর্বতী সময়ে নানান কারণে অভাবের কষাঘাতে পড়ে বেদখল হয়ে যায় তার জমি। যুদ্ধের পরবর্তী দিন মজুরী করে সংসার চালাতে বাধ্য হয়। সোমেন্দ্র টুডু কোন ভাই ছিল না তার তিন বোন ছিলো। চুড়কী টুডু, নীলমনি টুডু ও খুকি টুডু। তার স্ত্রীর নাম সুখিনা হাঁসদা। তাদের তিন ছেলে চার মেয়ে। প্রথম ছেলে রুপলাল টুডু- স্ত্রীর নাম সুমি মুর্মু তাদের সন্তান শ্রাবন টুডু ও সুশান্ত টুডু। দ্বিতীয় ছেলে বিশ্বনাথ টুডু স্ত্রীর নাম লক্ষি হাঁসদা তাদের সন্তান স্বজনী টুডু ও সুজন টুডু। তৃতীয় ছেলে সুকলাল টুডু অবিবাহিত। চার মেয়ে নাম হচ্ছে সুমি টুডু, তালামাই টুডু, শ্রীজল টুডু ও হাসিনা টুডু। সোমেন্দ্র টুডু পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন।

যুদ্ধের সময় যুবক ছিলেন। বয়স চব্বিশ বছর। দেশের পরিস্থিতি খারাপ দেখে ভারতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যুদ্ধের সময় পারগাঁও গ্রামে লুটপাট চালায় স্থানীয় রাজাকারেরা। নির্যাতন করতে থাকে নিরীহ বাঙালিদের উপর। আদিবাসী হয়ে তিনিও অনিরাপত্তায় ভুগছিলেন। পরিশেষে জানমাল রক্ষা করার জন্য পরিবারসহ ভারতের সাফানগরে শরনার্থী শিবিরে আশ্রয় নেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য যুবকদের আহবান করা হয়। তিনি জানতে পারেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের বাণী যা তিনি শুনে ছিলেন। বারবার তাকে বিচলিত করে তুলছিলো। ক্রোধে রক্ত টগবগ করে ফুটছিল তার সারা শরীরে। সেই আহবানে নিজেকে পরিবার থেকে বিছিন্ন করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চলে যান। ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়ে বাঙালি সেনাদের সাথে ও বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধেবিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় মিশনে যান।

বনে জঙ্গল গিয়ে লুকিয়ে থাকতেন। উপর থেকে অপারেশন খবর আসলে অপারেশনে চলে যেতেন। অনেক কষ্টের অভিজ্ঞতার কথা মাঝে মাঝে বলতেন। পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার, হত্যালীলা ও স্থানীয় রাজাকারের লুটপাটের দৃশ্য দেখে রাগে ক্ষোভে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। এ কথা তিনি বারবার উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত করতেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে ফিরে এসে দেখেন তার সব জমি স্থানীয় বাঙালি ও বহিরাগত বাঙালিরা দখল করেছে। কোর্ট-কাচারি গিয়েও কোন প্রতিকার পাননি। যারা জমি দখল করেছে তারা প্রভাবশালী।

মনের দুঃখ ও কষ্টের কথা সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সহযোগী মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কয়েক বার ঢাকায় গিয়েছিলেন কিন্তু কোন আশ্বাস পাননি। রাগে ক্ষোভে আক্ষেপে নিজের মনের কষ্টের কথা চাপা দিয়ে রাখেন। তবে মাঝে মাঝে দেশীয় মদ পান করে মাতাল হয়ে মনের অজান্তে মুক্তিযুদ্ধের অভিযানের কথা নিজ পরিজনদের কাছে বলতেন। স্বাধীনদেশে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারী মুক্তিযোদ্ধা সোমেন্দ্র টুডু পরাধীন হয়ে থাকতে থাকতে ২০২২ সালে ৭৫ বছর বয়সে অসুখে মারা যান। তার পরিবারের কাছ থেকে এসব জানা যায়।

ভিনসেন্ট টুডু

বয়স: ৭৫
মাতা: মৃত ফিলোমিনা মুর্মু
পিতা: মৃত মঙ্গলু টুডু
পেশা: কর্মহীন (বার্ধক্যজনিত কারণে)
লিঙ্গ: পুরুষ
মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর: ৭ নং
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পঞ্চম শ্রেণি
জাতিসত্তা: সাঁওতাল
ঠিকানা: পশ্চিম শিবরামপুর, ১নং চেহেলগাজী ইউনিয়ন, সদর, দিনাজপুর

ভিনসেন্ট টুডু দিনাজপুর সদর পশ্চিম শিবরামপুরে বসবাস করছেন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া জানা এই মুক্তিযোদ্ধা আজ বয়সের ভারে কর্মহীন। যুদ্ধের সময় তিনি নভারা টেকনিক্যাল স্কুলে কাঠমিস্ত্রীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। তার এক বোন বারফলেমিউ টুডু এবং দুই ভাই সোম টুডু ও জীবন টুডু। তার দুই স্ত্রী। প্রথম স্ত্রীর নাম ভিনসেন্সা মুর্মু ও তাদের চার মেয়ে যথাক্রমে প্রমীলা টুডু, মেনু টুডু, উর্মিলা টুডু ও শিউলী টুডু। দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম বার্তিলা মুর্মু (হীরা) ও তাদের এক ছেলেসন্তান সাগর টুডু। দেশ স্বাধীনের পরে তিনি কাঠমিস্ত্রীর কাজ করতেন। যুদ্ধের আগে

আর্থিক অবস্থা খুব ভালো ছিল না। বর্তমানে তার আর্থিক অবস্থা পূর্বের চেয়ে ভালো।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে তিনি তার পরিবার-সহ ভারতের গঙ্গারামপুর এলাকার শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ভারতের শিববাড়ী, বাগডবরা, শিলিগুড়ি, সরাইদিঘিতে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে তিনি ৭নং সেক্টরের কমান্ডার জনাব জর্জ-এর অধীনে যুদ্ধ করেন। তিনি হামজাপুর, রামসাগর সদর এলাকা ও এর আশেপাশে মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন মিশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হামজাপুর রামসাগর এলাকার একটি পাকিস্তানি-ক্যাম্পে তারা হামলা চালালে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এসময় তারা সেখানে অবস্থিত একটি বাঙ্কারে বিবস্ত্র অবস্থায় কয়েকজন নারীকে খুঁজে পায়। পরে তাদের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

যুদ্ধ শুরু হলে সবাই যখন ভারতে পালিয়ে যেতে শুরু করে তখন তার ভায়রা পারগানা কিস্কু বাংলাদেশে থেকে যায়। সে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে একটি বাঙ্কার খুঁড়ে সেখানে লুকিয়ে থাকতো। একদিন পাকিস্তানি বাহিনী তার বাঙ্কার খুঁজে পেলে সেখানে তাকে ধরে ফেলে এবং হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে কিন্তু সৌভাগ্যবশত গুলি তার ডান বাহুতে লাগলে সে লুটিয়ে পড়ে। পাকিস্তানিবাহিনী তাকে মৃত ভেবে বাঙ্কারেই ফেলে রেখে যায়। পরে তার জ্ঞান ফিরলে সে কোনোমতে সেখান থেকে বের হয়ে আসে এবং লোক মারফত তার আত্মীয়দের খবর দেয়। খবর পেয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া ভিনসেন্ট টুডু ও কয়েকজন এসে তাকে খাটিয়াতে করে ভারতের রায়গঞ্জে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে। পারগানা কিস্কু কিছুটা সুস্থ হলে সে তার ভায়রাকে বলে, 'আমাদেরকে পাকিস্তানিবাহিনীরা পাখির মতো গুলি করে মারছে, আমারতো পুরোপুরি সুস্থ হতে আরও সময় লাগবে, যদি তোর মনে সাহস থাকে তাহলে তুই প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে যা আর ঠিক ওদেরকেও পাখির মতো গুলি করে মার।' পরবর্তীতে ভিনসেন্ট টুডু তার ভায়রার কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

রাইফেল নিয়ে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহন করেন। সে সময় আরো কিছু আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা রাফায়েল টুডু, ওবরা কিস্কু, পিউস হেমব্রমসহ অনেক বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। বর্তমানে বয়স হয়ে যাওয়ায় তার সঙ্গী মুক্তিযোদ্ধাদের কারোর নাম মনে করতে পারছেন না। যুদ্ধ শেষ হওয়ার এক মাস পূর্বে তিনি-সহ আরও অনেক আদিবাসী ও বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা দেশে ফিরে আসেন। এই সময় তিনি দেখেন যে, তাদের বাড়িঘরগুলো সব ভাঙা। পরে তারা তাবু করে বসবাস করতে শুরু করেন। এই সময় তিনি-সহ আরও সাতজন আদিবাসী সাঁওতাল মুক্তিযোদ্ধা কুঠিবাড়িতে তাদের কমান্ডার জনাব জর্জ-এর বাড়ি মাসখানেক পাহারা দিয়ে রাখেন।

যুদ্ধ জয় করে তিনি-সহ তার সঙ্গী মুক্তিযোদ্ধারা অনেক শান্তি ও স্বাধীন অনুভব করেন। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের এক বছর পরে এক বন্যায় তার মুক্তিযুদ্ধের সনদটি হারিয়ে যায়। ফলে পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধাদের দেওয়া সরকারের সুযোগ সুবিধা তিনি নিতে পারেননি। বর্তমানে ভিনসেন্ট টুডু আফসোস করে বলেন, যদি আমার সার্টিফিকেট না হারাতো তাহলে অনেক সুবিধা পেতাম। কিন্তু সেই সময় কোথায় কী করতে হবে– সেটা বুঝতে পারিনি বলে সার্টিফিকেট উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

নামঃ ভিনসেন্ট মার্ডী
বয়স: ৬৫ বছর
পিতার নাম: জর্দান মারান্ডী (মৃত)
মাতার নাম: পার্বতী মুর্মু (মৃত)
পেশা: সেনাবাহিনী হতে অবসরপ্রাপ্ত
ঠিকানা: মির্জাপুর, রাজবাটি, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর

ভিনসেন্ট মার্ডী দিনাজপুর সদর উপজেলার মির্জাপুর গ্রামে বাস করেন। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তার ২ ছেলে। বড় ছেলে হেনরী মারান্ডী (শুভ্র) ল্যাম্ব হাসপাতালে কর্মরত আর ছোট ছেলে জাস্টিন মারান্ডী একাউন্টিং-এ অনার্স পাশ করেছে। বর্তমানে ভিনসেন্ট মার্ডী সেনাবাহিনী হতে অবসরপ্রাপ্ত এবং বাড়িতে অবস্থান করছেন। তিনি একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল ১৬ বছর। যুদ্ধের পর তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং ১৫ বছর সেনাবাহিনীতে চাকুরী করেন। বর্তমানে তিনি পেনশন-সহ মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পান। কিশোর বয়সে তিনি যুদ্ধের ভয়াভয়তা স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি দিনাজপুর সরকারি কলেজে- বিহারি ও খানদেরকেই গুলি করে হত্যা করতে দেখেছেন এবং মনে মনে খুশি হয়েছেন। তিনি পাকিস্তানি মেজর তারেককে সেই সময় কুঠিবাড়ির সামনে পায়চারি করতে দেখেছেন। তিনি জর্জ ভাইয়ের অধীনে ছিলেন। তার সাথে সেই সময় ধানজুরির লুইস, জুয়েল মাহাতো, ধীরেন মাহাতো কর্নেলিয়াস-সহ বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা মুন্সি, নূর ইসলাম, আজাহরুল ইসলাম জুয়েল এবং ঈদগাহ বস্তির তোয়াব ছিলেন। তিনি জানান, কর্নেলিয়াস ৬ জানুয়ারি ১৯৭২-এ মাইন ব্লাস্টে মারা গিয়েছিলেন। এপ্রিল-এর শেষে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য গিয়েছিলেন কিন্তু ধরা পড়ে যাওয়ায় ফাদার চেশকাতা উনাদের বাঁচান। তিনি সেই সময় ভাবতেন খান ও বিহারিদের মারাই দরকার কারণ ওরা এই দেশবাসীদের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করতো। যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ইরানিদের মারা হলে তিনি খুব খুশী হয়েছিলেন। কারণ ইরানিরাও বাঙালিদের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করতো। তিনি ৭ মার্চের ভাষণ রেডিও-তে শুনেছিলেন।

এপ্রিলেই ইস্টার সানডের দিন উনার পরিবার ভারতে পালিয়ে যায়। বিরল দিয়ে হামজাপুর, কাঁটাবাড়ি হয়ে গঙ্গারামপুরে গিয়ে সারাইদিঘী ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়। সেই সময় ক্যাম্পে এম আব্দুর রহিম-সহ আরও অনেকে প্রায় পরিদর্শনের জন্য আসতেন।

মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ে প্রথমে তিনি কোনো তথ্য দিতে রাজি হননি কারণ তার দুই ছেলের জন্য সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তরে চাকুরির জন্য আবেদন করলে কোন জায়গায় চাকুরি না হওয়াতে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতি তিনি নাখোশ এবং এ আক্ষেপ থেকে তিনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কোন তথ্য দিতে এবং প্রচারমাধ্যমে আসতে চান না।

জর্জ ভাইয়ের নেতৃত্বে তিনি পতিরামে দুইদিনের ইয়ুথ ক্যাম্পে যান এবং আসার সময় সারাইদিঘি ফিরে আসেন। তিনি মূলত রেকি করতেন। বয়স কম থাকায় তাকে অস্ত্র দেয়া হয়নি। তিনি জর্জ ভাইয়ের সাথে বিভিন্ন অপারেশনে গিয়েছিলেন। তিনি ভগলদিঘিতে রাজাকারের ক্যাম্প আক্রমণ করতে জর্জ ভাইয়ের সাথে এসেছিলেন।

গঙ্গারামপুর ক্যাম্পে তিনি এক বিহারিকে অত্যাচারিত হতে দেখেছেন এবং পরে জানতে পেরেছেন ঐ বিহারি মারা গেছেন। তিনি ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে তার অন্যান্য সাথীদের সাথে বালুবাড়ির মুন্সী, সাত্তার-সহ বিরল হয়ে দিনাজপুরে আসেন। ১৪ তারিখ মুন্সিপাড়া পুকুরের পাশে বাহার ডাক্তাররের বাড়ির সামনে জড়ো হলেন। তিনি সেখান থেকে বাড়ি গিয়ে দেখেন বাড়িঘর কিছুই নাই। তিনি ক্যাথলিক মিশনে আশ্রয় নেন। তার ভাই বাংলাদেশে ফিরেননি কারণ তিনি ভারতের মেয়েকে বিয়ে করে সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন। ১৮ ডিসেম্বর তিনি বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনে বড়মাঠে এসেছিলেন। তখনও অনেক জায়গায় যুদ্ধ চলছিল তবে দিনাজপুর স্বাধীন হয় ১৪ ডিসেম্বর।

স্বাধীন বাংলাদেশে কেমন আছে জানতে চাইলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন তার দুই ছেলেই শিক্ষিত কিন্তু সরকারি কোন চাকরিতেই সুযোগ দেয়া হয়নি তাদের। তিনি এই নিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরেছেন কিন্তু কোন কাজ হয়নি। তিনি বাড়ি মেরামতের জন্য ২০১৭ সালে আবেদন করেছেন। কিন্তু এই পর্যন্ত বাড়ি মেরামতের কোনো সাহায্য তিনি পাননি। এসব কারণে তিনি অত্যন্ত হতাশার মধ্যে জীবনযাপন করছেন।

উপসংহার

মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা অবিসংবাদিত। এই জেলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস সমৃদ্ধকরণের পেছনে বাঙালি জাতিসত্তার তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে- দিনাজপুর সদর উপজেলার আদিবাসীসমূহের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের পাশাপাশি আদিবাসী-সমাজের রয়েছে সুদীর্ঘ ঐতিহ্য। এই জেলার কৃষিজমি প্রস্তুতকরণ, রেলপথ ও রাস্তা-নির্মাণ, প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে তাদের ভূমিকা গৌরবদীপ্ত। তেভাগা আন্দোলনে প্রথম যে দুজন শহীদের নাম জানা যায় তাদের মধ্যে শিবরাম মাঝি ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছেন। ইংরেজ আমলের সূচনাপর্বে বিরল উপজেলায় একজন সাঁওতাল আদিবাসী পারু রাজা ঐ অঞ্চলের ঝাড়জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষি জমির যে পত্তন করেছিলেন সেটা একটি অনন্য নজির হয়ে আছে। ‘কোরফা প্রজা আন্দোলন’, ‘রায়তি আন্দোলন’, ‘তোলাবাটি আন্দোলন’ শেষে ‘তেভাগা আন্দোলন’-এ এসে আমরা আদিবাসী সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ করি। হাজী মোহাম্মদ দানেশ, রূপনারায়ণ রায়, গুরুদাস তালুকদার, সুশীল সেন-সহ প্রমুখ তেভাগা রাজনীতিকদের পাশাপাশি কর্মী হিসেবে হেলেকুতু সিং, কম্পরাম সিং, শিবরাম মাঝি’র নাম যেমন মুছে ফেলা যায় না; তেমনি রয়েছে নাম না জানা অসংখ্য আদিবাসী যারা হিন্দু ক্ষত্রিয় সমাজ, মুসলিম কৃষিভিত্তিক মানুষদের সঙ্গে হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলন করেছেন। যে কারণে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের সময় উভয় বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গার সৃষ্টি হলেও দিনাজপুর অঞ্চলের মানুষজন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে জমিতে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য ভাগের জন্য করেছে তেভাগা আন্দোলন। ১৯৪৭ পরবর্তী পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের ২৩ বছরে এই অঞ্চলে সংগঠিত আন্দোলন, শ্লোগান ও মিছিলে বাঙালিদের পাশাপাশি আদিবাসী সমাজ এগিয়ে এসেছে। দেশি-অস্ত্র ব্যবহারে পটু এই সমাজ, অত্রঅঞ্চলের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও কৃষি আন্দোলনে বারবার বাঙালিদের পাশে থেকেছে। পাকিস্তানিদের চাপিয়ে দেওয়া সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। যার প্রমাণ পাই আমরা ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ভাষার কৃষ্টি-কালচার আন্দোলন, রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পালনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানি সেনাশাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিরা যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল, তাদের পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল আদিবাসী সমাজ। এরপর বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা এবং এগারো দফা আন্দোলনে এই অঞ্চলের আদিবাসী সমাজ ছিল সক্রিয়। এই অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পরিবারদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার-পর্বে আমরা দেখেছি, তারা বারবার মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব বাঙালি ও আদিবাসীদের সম্প্রীতির কথা উল্লেখ

করেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের চাপিয়ে দেওয়া আইনের বিরুদ্ধে বাঙালিদের পাশাপাশি যে তারাও ছিল সেই কথা উল্লেখ করেছেন। আদিবাসীদের জমি বিক্রির ক্ষেত্রে সেই সময় যে জটিলতাগুলো তৈরি হতো, তাতে বাঙালিদের তুলনায় বিহারি সম্প্রদায়, অধিকমাত্রায় সংশ্লিষ্ট ছিল সেই কথা তারা উল্লেখ করেন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক-দিক দিয়ে সেই সময়ে বাঙালি ও আদিবাসী সমাজের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। তখন তাদের শাসক ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানিরা আর শোষিতের কাতারে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাঙালি ও আদিবাসীরা। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পরে দৃশ্যচিত্র একদম পাল্টে গেছে। বাঙালিদের পাশাপাশি থেকেই যে আদিবাসী-সমাজ অসহযোগ আন্দোলনের অংশী হয়েছিল, ১৯৭০-এর নির্বাচন পরিপ্রেক্ষিতে ৭ মার্চের ভাষণ-এ উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে- সেই আদিবাসী-সমাজ স্বাধীন বাংলাদেশে কেনো অস্তিত্ব-বিপন্নতায় পড়ছে? এমনই প্রশ্ন রেখেছেন অনেক আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা। আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে পাত্রাস হাঁসদা মুক্তিযুদ্ধপূর্ব বাঙালি ও আদিবাসী সৎ সম্পর্কের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। তিনি তার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পেছনে জর্জ ভাইকে প্রেরণা হিসেবে দেখেছেন। মুক্তিযোদ্ধা রবিন সরেন পাকিস্তান আর্মিতে কাজ করতেন। যুদ্ধের সময় তিনি বাঙালিদের পক্ষ নেন। সেই সময় তার বন্ধু মাহাবুবকে সম্মুখ সমর থেকে বাঁচিয়ে আনতে পারেননি বলে যে কষ্টের স্মৃতি উল্লেখ করেছেন, তা অভাবনীয়। বন্ধুর লাশটি কুকুর-শেয়ালে খেয়েছে। তার করুণ পরিণতিতে তিনি যেভাবে কেঁদেছিলেন! তার দাফন করতে পারেননি বলে যে কষ্ট তার মনে ছিল, তা সত্যিই বিরল। এই বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির বাংলাদেশই আমরা চাই। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি যেমন তার হাজার বছরের স্বাধীন-ভূমির স্বপ্নকে পূরণ করেছে, তেমন সংকরায়িত বাঙালির নিকট-আত্মীয় এই আদিবাসী সমাজও চেয়েছিল বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যময় সংহতি। মুক্তিযুদ্ধে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের পাশাপাশি নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য নিয়ে আদিবাসীরাও সগৌরবে অংশগ্রহণ করেছে। তারই ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠেছে *মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী: দিনাজপুর সদর উপজেলা* শীর্ষক গ্রন্থটি।

পরিশিষ্ট-১
মাঠ পর্যায়ে তথ্য নথিভুক্তকরণ দল

মানিক সরেন, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ

জগেন মিনজি, সহকারি প্রকল্প সমন্বয়কারী, 'অধিকার' প্রকল্প, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র

সাইদুর রহমান, কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর, 'অধিকার' প্রকল্প, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র

রবিন হেমব্রম, কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর, 'অধিকার' প্রকল্প, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র

ইভা মুরমু, কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর, 'অধিকার' প্রকল্প, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র

মন্ত্রী বাস্কে, কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর, 'অধিকার' প্রকল্প, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র

সোহাগিনী হাঁসদা, কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর, 'অধিকার' প্রকল্প, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র

জনতী হেমব্রম, কমিউনিটি মোবিলাইজার, 'অধিকার' প্রকল্প, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র

বার্নাবাস সুবাস কিস্কু, ছাত্র, বেগম রোকেয়া ইউনির্ভাসিটি ও স্বেচ্ছাসেবক

তুষার শুভ্র বসাক, কবি ও গবেষক

অধিকার প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবকগণ

পরিশিষ্ট-২
সারণি: দিনাজপুর সদর উপজেলার আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা

ক্রমিক	মুক্তিযোদ্ধার নাম	বয়স	জাতিসত্তা	বর্তমান পেশা	বর্তমান ঠিকানা
১	রারণ কিস্কু	৭২	সাঁওতাল	অটো চালক	গ্রাম: যমুনা পাড়া, ইউনিয়ন: ৬ নং আউলিয়পুরউপজেলা: সদর, দিনাজপুর
২	পাত্রাস হাঁসদা	মৃত	সাঁওতাল	প্রযোজ্য নয়	গ্রাম: মির্জাপুর ইউনিয়ন: পৌরসভা উপজেলা: সদর, দিনাজপুর
৩	জুলিয়াস হাঁসদা	মৃত	সাঁওতাল	প্রযোজ্য নয়	গ্রাম: মির্জাপুর ইউনিয়ন: পৌরসভা উপজেলা: সদর, দিনাজপুর
৪	ব্রিসিউস বারলা	মৃত	ওরাওঁ	প্রযোজ্য নয়	গ্রাম: মির্জাপুর ইউনিয়ন: পৌরসভা উপজেলা: সদর, দিনাজপুর
৫	ইসাহাক সরেন	মৃত	সাঁওতাল	প্রযোজ্য নয়	গ্রাম: কসবা ইউনিয়ন: পৌরসভা উপজেলা: সদর, দিনাজপুর
৬	ভিনসেন্ট টুডু	৭৫	সাঁওতাল	বার্ধক্য জনিত কারণে কর্মহীন	গ্রাম: পশ্চিম শিবরামপুর ইউনিয়ন: ১ নং চেহেলগাজী উপজেলা: সদর, দিনাজপুর
৭	রবিন সরেন	৮৭	সাঁওতাল	কৃষিকাজ	গ্রাম: পারগাঁও লালদিঘী ইউনিয়ন: ৩ নং ফাজিলপুর

					উপজেলা: সদর, দিনাজপুর
৮	নরেশ সরকার মুরমু	৬৬	সাঁওতাল	দিনমজুর	গ্রাম: খোশালপুর ইউনিয়ন: ২ নং সুন্দরবন উপজেলা: সদর, দিনাজপুর
৯	সুকু সরেন	মৃত	সাঁওতাল	প্রযোজ্য নয়	গ্রাম: পারগাঁও ইউনিয়ন: ৩ নং ফাজিলপুর উপজেলা: সদর, দিনাজপুর
১০	ভিনসেন্ট মার্ডী	৬৭	সাঁওতাল	অবসর প্রাপ্ত	গ্রাম: মির্জাপুর ইউনিয়ন: পৌরসভা উপজেলা: সদর, দিনাজপুর
১১	সোমেন্দ্র টুডু	মৃত	সাঁওতাল	প্রযোজ্য নয়	গ্রাম: পারগাঁও ইউনিয়ন: ৩ নং ফাজিলপুর উপজেলা: সদর, দিনাজপুর
১২	লক্ষণ মার্ডী	মৃত	সাঁওতাল	প্রযোজ্য নয়	গ্রাম: তালপুকুর ইউনিয়ন: ৬ নং আউলিয়াপুর উপজেলা: সদর, দিনাজপুর
১৩	গনেশ চন্দ্র রায়	মৃত	রবিদাস	প্রযোজ্য নয়	গ্রাম: যোগী বাড়ি ইউনিয়ন: ৬ নং আউলিয়াপুর উপজেলা: সদর, দিনাজপুর

পরিশিষ্ট-৩
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আতিকুর রহমান : ‘জাতির পিতা ও পতাকা কাহিনী’, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ও সাহিদা বেগম : ‘মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আইনজীবী’, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

আজহারুল আজাদ জুয়েল : ‘অর্ধশতাব্দীর নির্বাচনী লড়াইয়ে বৃহত্তর দিনাজপুর’, গণসাক্ষরতা সাংবাদিক ফোরাম, দিনাজপুর, জুলাই ১৯৯৬

: ‘মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর দিনাজপুর’, সুবচন, দিনাজপুর, ফেব্রুয়ারি ২০০২

আতাউর রহমান (সম্পাদনা) : ‘আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম’, নওরোজ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭

আসাদুজ্জামান আসাদ : ‘মুক্তি সংগ্রামে বাংলা’, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭

এম. আর. আখতার মুকুল : ‘আমি বিজয় দেখেছি’, সাগর পাবলিসার্স, ঢাকা, অগ্রহায়ণ ১৩৯১

এম. এ কাফি সরকার : ‘মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুর’, অঙ্কুর প্রকাশনী, দিনাজপুর, মার্চ ১৯৯৬

ধনঞ্জয় রায় : ‘বিশ শতকের দিনাজপুরঃ মন্বন্তর ও কৃষক আন্দোলন', পুনশ্চ প্রকাশনী, কোলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৭

নুরুল ইসলাম খান (সম্পা.) : ‘বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ারঃ বৃহত্তর দিনাজপুর’, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ঢাকা, জুলাই ১৯৯১

: ‘একাত্তরের ঘাতক-দালাল যা বলেছে যা করেছে’, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

পাভেল পার্থ ও মোয়াজ্জেম হোসেন : ‘উত্তরবঙ্গের আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা (প্রথম ভাগ)’, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, দিনাজপুর, মে ২০০৯

ফজলুর রহমান : ‘বাংলাদেশে গণহত্যা’, মুক্তধারা, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৭২

বশীর আল হেলাল : ‘ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস’, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৮৫

মাহবুব আলম : 'গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে - ২য় খণ্ড', সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

মেহরাব আলী : 'দিনাজপুরের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস', নওরোজ সাহিত্য মজলিশ, দিনাজপুর, মে ১৯৬৫

: 'দিনাজপুরের সাংবাদিকতার একশ বছর', বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট, ঢাকা, জুলাই ১৯৯৪

মেজর রফিকুল ইসলাম : 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধঃ প্রতিরোধের প্রথম প্রহর', ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

: 'মুক্তিযুদ্ধের দুশো রণাঙ্গন', অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

: 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে', অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৮

মিজানুর রহমান চৌধুরী : 'রাজনীতির তিন কাল', হাফেজ মাহমুদা ফাউন্ডেশন, ঢাকা, মার্চ ২০০১

শরীফ উদ্দিন আহমেদ : 'দিনাজপুর ইতিহাস ও ঐতিহ্য', বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা, জুলাই ১৯৯৬

শেখর দত্ত : 'তেভাগা আন্দোলন', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৫

সিরাজ উদ্দীন আহমেদ : 'বাংলাদেশ গড়লো যারা', ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি

সেলিনা হোসেন : 'ঊনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থান', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৫

শাহজাহান শাহ

ড. মাসুদুল হক : 'মুক্তিযুদ্ধ : দিনাজপুর', গতিধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮

পরিশিষ্ট-৪
এ্যালবাম

সাঁওতাল মুক্তিযোদ্ধা রাবণ কিস্কু

সাঁওতাল মুক্তিযোদ্ধা রবিন সরেন

এ্যালবাম

সাঁওতাল মুক্তিযোদ্ধা ভিনসেন্ট টুডু

সাঁওতাল মুক্তিযোদ্ধা নরেশ সরকার মুর্মু

এ্যালবাম

সাঁওতাল মুক্তিযোদ্ধা ভিনসেন্ট মার্ডী

ওরাওঁ মুক্তিযোদ্ধা ব্রিসিউস বারলা

সমীক্ষা ক্ষেত্রে

সমীক্ষা ক্ষেত্রে

সমীক্ষা ক্ষেত্রে